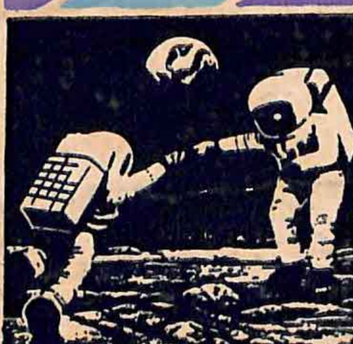
অনীশ দেব

বিজ্ঞানের দশ দিগন্ত



বিজ্ঞানের দশ দিগন্ত

বিজ্ঞানের দশ দিগন্ত

অনীশ দেব

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

VIJNANER DUSH DIGANTA

By Anish Deb

A collection of popular Science articles

□ প্রথম প্রকাশ : বড়দিন পৌষ ১৩৯৪ / ডিসেম্বর ১৯৮৭

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রাকর : অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

□ প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

ষোলো টাকা

পিসিমণি শ্রীমতী প্রিয়বালা রক্ষিতকে

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক বই

সবুজ পাথর

বিজ্ঞানের হরেক রকম

অভিশপ্ত দ্বীপ (সম্পাদিত)

'বিজ্ঞানের দশ দিগন্ত' ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত / পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এক ডজন বিজ্ঞান নিবন্ধের সংকলন। বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখির সবচেয়ে বড় বিপদ হলো বিজ্ঞানের লেখা সব সময়েই পুরোনো হয়ে যায়। কারণ বিজ্ঞান সব সময়েই বড় দ্রুত এগিয়ে চলে। তবুও প্রকাশের সময় পর্যন্ত যতোটা তাল রাখা যায় লেখাগুলো ততোটা সম্পাদনা ও সংস্করণের চেষ্টা করেছি। আর কয়েকটি লেখার বিষয়, বিজ্ঞানের ইতিহাস ও বিজ্ঞানীর ইতিকথা—এ ধরনের লেখাগুলোয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির চাবুকের ভয় নেই। তবে ইতিহাস সব সময়েই বিতর্কের বস্তু। এই সব সম্পর্কে সচেতন থেকে উল্লেখযোগ্য আকরগ্রন্থ ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। তাদের দীর্ঘ তালিকা দিয়ে পাঠককে বিরক্ত করতে চাই না। তবে যদি কোনও পাঠকের চোখে কোনও তথ্য বা তত্ত্বগত ত্রুটি ধরা পড়ে তা জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো, আর একই সঙ্গে পরবর্তীকালে তা সংশোধনের চেষ্টা করবো।

অনুসন্ধানী পাঠকের জন্য জানাই বইয়ের পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়, দুটি অধুনালুপ্ত শিলাদিত্য-এ, আর মহানগর, শুকতারা, নবম-দশম (অধুনা-লুপ্ত এটিও), যুগান্তর সাময়িকী ও কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এ একটি করে। এই সব পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাই। এই ছড়ানো-ছেটানো লেখাগুলোকে গ্রন্থিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন মডার্ন কলামের শ্রীমতী লতিকা সাহা। তাঁকে ধন্যবাদ জানালে, সন্দেহ নেই, ধৃষ্টতা দেখানো হয়।

বইয়ে ব্যবহৃত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি ব্যবহার করেছি ডি. ই. স্মিথ-এর 'হিস্ট্রি অফ ম্যাথামেটিক্স' এবং কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত 'করেসপণ্ডেন্স অফ স্যার আইজাক নিউটন' গ্রন্থ থেকে।

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ
৯২, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

অনীশ দেব
বড়দিন, ১৯৮৮

জাহাজ আমাদের সকলেরই খুব চেনা। সাগর পাড়ি দিতে হলে এই বাহনটির সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। তবে জাহাজ জলের ওপরে ভেসে চলে। জলের নিচে পাড়ি জমাবার সাধ্য নেই তার। ফলে জলের নিচে ভেসে বেড়ানোর চিন্তা যখন মানুষের মাথায় ঢুকলো তখন ডাক পড়লো ডুবোজাহাজের।

ডুবোজাহাজের প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন ব্রিটিশ অঙ্কবিদ উইলিয়াম বোর্ন। সময়টা ছিল ১৫৭৮ সাল। তাঁর বর্ণনায় ডুবো-জাহাজের চেহারা ছিলো, কাঠের তৈরি জলযানের ওপরে জলনিরোধক চামড়ার আস্তরণ। কিন্তু বোর্ন-এর পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

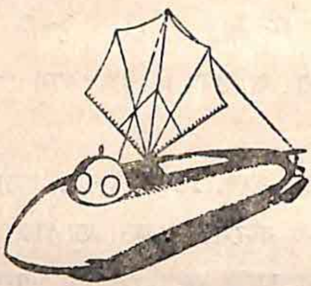
এর বিয়াল্লিশ বছর পরে, ১৬২০ সালে, হল্যাণ্ডবাসী আবিষ্কারক কর্নেলিস ড্রেবেল্ একই ধরনের একটা ডুবোজাহাজ তৈরি করলেন। ডুবোজাহাজ না বলে তাকে 'ডুবো-নৌকো' বলাই ভালো। জলের প্রায় ৪ মিটার নিচে বারোজন নাবিক মিলে সেই ডুবো-যানকে চালাতে সফলও হলো। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য। সেই সময়ে অন্যান্য দেশের আবিষ্কারকরাও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ডুবো-জাহাজ তৈরি করতে। তাঁদের মধ্যে সফল যিনি হলেন তাঁর নাম



বুশ্‌নেল-এর 'টার্ট্‌ল্'

ডেভিড বুশ্‌নেল—আমেরিকার ইয়েল কলেজের ছাত্র। তিনি তাঁর জলযানটির নাম দিয়েছিলেন 'টার্ট্‌ল্' বা 'কচ্ছপ'।

'টার্ট্‌ল্‌'-এর আকৃতি ছিলো ডিমের মতো, তবে সেটা জলের মধ্যে খাড়াভাবে ভাসতো। যানের ভিতরে মাত্র একজন মানুষের বসার ব্যবস্থা ছিলো। সে হাতে করে একটা প্রপেলারকে ঘোরালে ডুবোযানটি চলতে আরম্ভ করতো। যানটির প্লবতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ছিলো একটি জলের ট্যাঙ্ক, ছিলো দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস, জলের গভীরতা মাপার জন্য একটা সহজ যন্ত্র, আর দুলুনি কমানোর জন্য একটা ভারী ওজন। 'টার্ট্‌ল্‌'-কে যুদ্ধের কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু তাতে যানটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এক বোমা বিস্ফোরণে।



ফুলটন-এর 'নটিলাস'

এরপরে ১৮০০ সাল নাগাদ চুরুটের চেহারার একটি সাবমেরিন তৈরি করেন আমেরিকার রবার্ট ফুলটন। এই জলযানটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩০·৫ মিটার। ভেতরে দুজন নাবিকের জায়গা রাখা হয়েছিলো। আর বেশ কয়েক ঘণ্টা জলের তলায় থাকতে পারতো ডুবোজাহাজটি। এছাড়া একটা অদ্ভুত গুণ ছিলো ফুলটন-এর জাহাজের। এতে টর্পেডো ছোড়ার ব্যবস্থা ছিলো। সুতরাং সাবমেরিন যে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার হতে পারে, সেই ধারণা প্রথম জন্ম নিয়েছিলো রবার্ট ফুলটনের মগজে। তিনি এই ডুবোজাহাজটির নাম দিয়েছিলেন 'নটিলাস'। জলের ওপরে ভেসে ওঠার জন্য সাবমেরিনের যে ঊর্ধ্বচাপ বা প্লবতা দরকার হয়, সেটার ব্যবস্থা ফুলটন করেছিলেন বেশ বিচিত্র উপায়ে। নটিলাসের ওপরে একটা অদ্ভুত পাল লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

এরপর ডুবোজাহাজের গঠনের নানান উন্নতি হতে লাগলো।

তৈরি হলো প্রায় ১৮.৩ মিটার লম্বা সাবমেরিন 'হান্‌লি'। মার্কিন নৌবাহিনী প্রথম যে সাবমেরিনটি কিনেছিলো, তাঁর নাম 'হল্যাণ্ড'। 'হল্যাণ্ড' ছিলো প্রায় ১৬ মিটার লম্বা। তাতে ব্যবহার করা হয়েছিলো ব্যাটারি চালিত মোটর ও গ্যাসোলিন-এর ইঞ্জিন। 'হল্যাণ্ড'-কে টর্পেডো, ডিনামাইট, ইত্যাদি দিয়ে সশস্ত্র করার ব্যবস্থাও ছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে-সব ডুবোজাহাজ আমেরিকা ব্যবহার করেছিলো সেগুলোর গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় ৯১.৫ মিটার।

ডুবোজাহাজের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটালো পারমাণবিক শক্তি। পারমাণবিক শক্তি চালিত ডুবোজাহাজ প্রথম তৈরি করলো আমেরিকার নৌবাহিনী। ১৯৫৪ সালে তৈরি এই সাবমেরিনটির নাম দেওয়া হলো 'ইউ. এস. এস নটিলাস'। এরপর তৈরি হলো 'ইউ. এস. এস. স্কিপজ্যাক'। ১৯৫৮ সালে তৈরি এই সাবমেরিনটির চেহারা অনেকটা তিমির মতো। এর ঠিক দু-বছর পরেই এলো 'ইউ. এস এস. ট্রাইটন'। পারমাণবিক শক্তি চালিত এই ডুবোজাহাজটি প্রথম জলের তলায় পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলো। অর্থাৎ, একটি বারের জন্যেও সে জলের ওপরে ভেসে ওঠেনি। এই পরিক্রমার মোট পথ ছিলো ৬৬,৪০০ কিলোমিটার। মাত্র তিন মাসে এতোটা পথ পাড়ি দিয়েছিলো 'ট্রাইটন'। যখন তৈরি হয়, তখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডুবোজাহাজ ছিলো 'ট্রাইটন'। এর দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় ১৩৬ মিটার, আর ওজন প্রায় ৭৬৫০ মেট্রিক টন।

এরপর সবচেয়ে শক্তিশালী যে সাবমেরিন তৈরি হয় তার নাম 'পোলারিস'। এই সাবমেরিন এক-একটা তৈরি করতে খরচ পড়েছে ১০ কোটি ডলারেরও বেশি! কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো সব সাবমেরিনই যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি। অতল সাগরের নিচে কত যে অজানা রহস্য রয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নেই। অথচ ডুবোজাহাজকে মানুষ কিন্তু সে কাজে লাগাতে পারেনি। কেন পারেনি তার কারণ খুবই সহজ: সমুদ্রের জলের চাপ। গভীর সমুদ্রে

এই জলের চাপ এতো বেশি যে সেখানে পরমাণু-শক্তি চালিত 'ট্রাইটন' কি 'পোলারিস', সবই অচল। সেই গভীর অতলে জলের প্রচণ্ড ভয়ংকর চাপে সমস্ত বাঘা বাঘা সাবমেরিনই তুবড়ে-দুমড়ে দলা পাকিয়ে যাবে। মনে হবে ইস্পাতের নয়, যেন কাগজের তৈরি জাহাজ! ঘটনাটায় যদি সামান্য অবিশ্বাস কারো থেকে থাকে, তাহলে তার জন্য একটা পরিষ্কার হিসেব দেওয়া যাক।

সাধারণভাবে আমাদের শরীরে বায়ুমণ্ডল যে চাপ দেয়, তার পরিমাণ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে মোটামুটিভাবে ১ কিলোগ্রাম। তাহলে আমরা কল্পনা করে নিই ১ সেন্টিমিটার বাহুবিশিষ্ট একটা চৌকো পাত ধীরে ধীরে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাগরের জলে। পাতটা যখন জলের ঠিক ওপরে রয়েছে তখন তার ওপরে চাপ মাত্র ১ কিলোগ্রাম। যখন সেটা জলের ১০ মিটার গভীরে ডুবিয়ে দেওয়া হবে তখন তার ওপরে চাপ পড়বে ২ কিলোগ্রাম ২০০ গ্রাম ১০০ মিটার নিচে গেলে চাপের পরিমাণ হবে ১৩ কিলোগ্রাম। ১০০০ মিটারে ১২১ কিলোগ্রাম। ১০ কিলোমিটারে ১২০১ কিলোগ্রাম। এই চাপ পড়ছে কিন্তু মাত্র ১ বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফলের ওপরে। তাহলে গোটা সাবমেরিনের ক্ষেত্রফলের ওপরে কি প্রচণ্ড পরিমাণে ঘাত পড়বে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

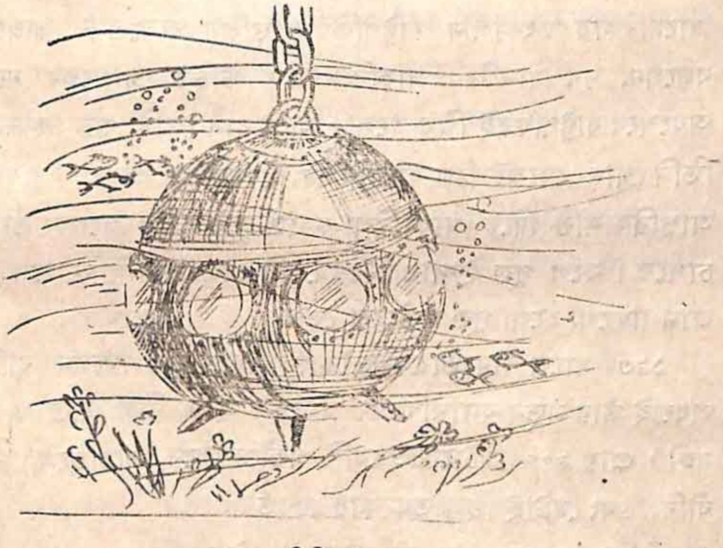
ডুবুরীর পোশাকে মানুষ মাত্র শ'খানেক মিটার জলের গভীরে যেতে পারে। তখন তার শরীরের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফলে চাপ পড়ে মোটামুটি ১৩ কিলোগ্রাম। অর্থাৎ, ডাঙায় যে স্বাভাবিক চাপ আমরা অনুভব করি তার প্রায় ১১ গুণ! সেই তুলনায় ডুবোজাহাজের কৃতিত্ব ডুবুরীদের চেয়ে কিছু বেশি, কিন্তু খুব বেশি নয়।

পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর গড়পড়তা গভীরতা প্রায় ৩·৫ কিলোমিটার। আর প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের গড় গভীরতা যথাক্রমে ৪·৫, ৩·৫ ও ৪ কিলোমিটার। এরকম অতল গভীরে ডুবোজাহাজ পাঠিয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে দরকার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ডুবোজাহাজ। তাছাড়া বিভিন্ন মহা-

সাগরের তলায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাদ রয়েছে, যাদের বলা হয় 'ডীপ' বা 'গহ্বর'। এগুলোকে হিসেবের মধ্যে নিয়ে এলে প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বোচ্চ গভীরতা প্রায় ১১ কিলোমিটার, আর আটলান্টিকের ৯ কিলোমিটার! সুতরাং সব মিলিয়ে মানুষের দরকার পড়লো 'গভীর জলের জাহাজ' বা 'ব্যাথিস্কেফ'।

গ্রীক ভাষায় 'ব্যাথি' শব্দের অর্থ 'গভীর,' আর 'স্কেফ' শব্দটির অর্থ 'জাহাজ'। দুইয়ে মিলে 'গভীরের জাহাজ' বা 'গভীর জলের জাহাজ'। ১৮০০ সাল নাগাদ সাবমেরিন তৈরিটা মানুষের রপ্ত হয়ে গেলেও পৃথিবীর প্রথম 'ব্যাথিস্কেফ' তৈরি হয় ১৯৩০ সালে—তৈরি করেন আমেরিকার প্রকৃতিবিদ চার্লস উইলিয়াম বীবি। অবশ্য তিনি জলযানটির নাম দিয়েছিলেন 'ব্যাথিস্ফিয়ার'—'গভীর জলের গোলক'।

১৯২২-২৩ সাল নাগাদ চার্লস বীবির মাথায় সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার পরিকল্পনাটি জন্ম নেয়। প্রবাল ছিলো তাঁর খুব প্রিয়। তিনি চেয়ে-



ব্যাথিস্ফিয়ার

ছিলেন সমুদ্রের গভীরে গিয়ে অক্ষত ও অটুট অবস্থায় প্রবাল পর্যবেক্ষণ করতে। কি করে তা করা সম্ভব সে-কথা ভাবতে ভাবতে

'ব্যাথিস্ফিয়ার'-এর কথা তাঁর মনে হয়। যানটির গঠন খুবই সরল ঃ ইস্পাতের একটি গোলক। তাতে কয়েকটি ছোট ছোট স্বচ্ছ জানলা আছে। কোনও জাহাজ থেকে শিকলে বেঁধে সেটা ধীরে ধীরে ডুবিয়ে দিতে হয় সমুদ্রের গভীরে।

প্রথমবার ঝাঁপ দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার গভীরে নেমেছিলেন বীবি। এই প্রসঙ্গে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের কথা অনেকের মনে পড়তে পারে। কারণ তাঁর 'ম্যারাকট ডীপ' নামে কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাসে এইরকম একটি ব্যাথিস্ফিয়ারে চেপে অতল সাগরে রোমাঞ্চকর অভিযানের কথাই লিখেছিলেন স্যার আর্থার। আরও আশ্চর্যের কথা, উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে। তখন বীবি সবে মাত্র একটি সমুদ্র-ঝাঁপ দিয়েছেন। তাঁর আসল ব্যাথিস্ফিয়ার তখনও তৈরিই হয়নি!

প্রথমে বীবি ভেবেছিলেন তাঁর ডুবোযানের চেহারা করবেন চোঙের মত। কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁরই এক বিখ্যাত বন্ধু—আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট। রুজভেল্ট বললেন, না, যানটির আকৃতি হওয়া উচিত গোলকের মতো। অবশেষে রাষ্ট্রপতিরই জিত হলো। বীবি যান তৈরি শুরু করলেন। তিনি গোড়া থেকেই ঠিক করেছিলেন, বৈজ্ঞানিক কায়দা নয়, স্রেফ আসুরিক শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে গভীর জলের ভয়ংকর চাপকে। ফলে পুরু ইস্পাত দিয়ে তৈরি হলো ব্যাথিস্ফিয়ার। তার জানলাগুলো হলো পুরু স্ফটিকের তৈরি।

১৯৩৪ সালে বারমুডার কাছাকাছি সমুদ্রে ডুব দিলেন বীবি—অবশ্যই তাঁর নতুন ব্যাথিস্ফিয়ার নিয়ে। সঙ্গে ছিল মাত্র একজন সঙ্গী। প্রায় ৯০০ মিটারেরও বেশি গভীরে যেতে পেরেছিলেন চার্লস বীবি, এবং সেটাই ছিল তখনকার রেকর্ড।

বীবি ভাবেননি তাঁর এই সমুদ্র-ঝাঁপ বৈজ্ঞানিকদের খুব একটা কাজে লাগবে। তাই বার তিরিশ সমুদ্রের নিচে অভিযান চালানোর পর তিনি ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন ক্ষান্ত হলো

না। ফলে ১৯৪৯-এ ওটিস বার্টন একই ধরনের একটি যানে চড়ে ১৪০০ মিটার গভীরে ডুব দিলেন। বার্টন তাঁর যানের নাম দিয়েছিলেন 'বেন্‌থোস্কোপ'—গ্রীক ভাষায় যার অর্থ হলো 'সমুদ্রের গভীরে দেখার যন্ত্র'।

গভীর জলে অভিযান চালানোর ব্যাপারে বীবির পরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিজ্ঞানী তিনি হলেন সুইজারল্যাণ্ডের পদার্থবিদ অগাস্ত্‌ পিকার।

পিকার জুরিখে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং সেই সময়েই তড়িৎবিদ্যা সংক্রান্ত মাপজোখের কিছু যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যাপারে অনন্য প্রতিভা আইনস্টাইনের সংস্পর্শে আসেন। মহাজাগতিক রশ্মির বিষয়ে পিকারের খুব আগ্রহ ছিলো। ফলে সদাই তাঁর মন চাইতো আকাশে পাড়ি দিতে। তখন মানুষ বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত নানান পর্যবেক্ষণের জন্য আকাশে উড়ে যেতো বেলুনের সাহায্যে।

১৯৩১ সালে পিকার একজন সঙ্গীকে নিয়ে জার্মানীর অসবার্গ থেকে বেলুনে চেপে ভেসে পড়লেন আকাশে। প্রায় ১৫কিলোমিটার ওপরে ১৮ ঘণ্টা ধরে নানান পর্যবেক্ষণের কাজ সেরে ফিরে এলেন। এতেই পিকার আনন্দ পেতেন।

পিকার-এর এক যমজ ভাই ছিলো। আমেরিকায় এসে তাকে সঙ্গী করে ১৯৩২ সালে আবার আকাশে অভিযান চালালেন অগাস্ত্‌ পিকার। এমনি করে সাতাশ বার তিনি বেলুনে চেপে ভেসে পড়েছিলেন। কিন্তু এই আকাশপ্রেমী মানুষটি যে আকাশ জয় করার পর পাতালপ্রেমী হয়ে পড়বেন সে-কথা তিনি নিজেও হয়তো ভাবেননি। তাঁর এই ভাবনার সূত্রপাত হয় ১৯৩৩ সালে। অতল জলে অভিযানের পথিকৃৎ চার্লস বীবি-র সঙ্গে শিকাগো বিশ্বমেলায় দেখা হলো অগাস্ত্‌ পিকার-এর। এবং ১৯৩০-এর দশকের শেষাশেষি 'অতল জলের জাহাজ'-এর পরিকল্পনা শুরু করেন তিনি।

পিকার-এর 'ব্যাথিস্ফিয়ার'-এর মূল অংশ ছিলো দুটো। ওপরের

অংশটি একটা বিশাল চুরুট-আকৃতির ট্যাঙ্ক। তাতে অনেকগুলো ঘর, এবং বেশিরভাগ ঘরেই পেট্রল ভরা থাকে। জলের তুলনায় পেট্রল হালকা—অর্থাৎ, তার ঘনত্ব কম। ফলে, ঐ পেট্রল-ভরা ট্যাঙ্কটি, 'বাথিস্ফিয়ার'-কে ভাসিয়ে তুলতে সাহায্য করে। পিকার-এর যানের নিচের অংশটি চার্লস বীবির মতোই—একটি ইস্পাতের গোলক। গোলকটিকে জলে ডুবিয়ে দিতে হলে পেট্রল-ট্যাঙ্কের দুটি কি তিনটি ঘরে সমুদ্রের জল ভরে নেওয়া হয়। তাছাড়া গোলকের ভেতরে রাখা থাকে টন-টন লোহার গুলি। সেগুলো দরকার মতো সমুদ্রে ফেলে দিলেই যানটি হালকা হয়ে পড়ে এবং যানের নিচে নামার গতি কমে আসে। প্রয়োজন হলে আরও ওজন কমিয়ে যানটি ধীরে ধীরে ভেসেও উঠতে পারে ওপরে।

পিকার যানটির নাম দিয়েছিলেন 'ব্যাথিস্কেফ'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় ১৯৪৬-এর আগে যানটির তৈরির কাজ শুরু করা যায়নি, এবং সে-কাজ শেষ হয় ১৯৪৮-এ। পিকার-এর 'ব্যাথিস্কেফ'-এ মোটরচালিত দুটি প্রপেলার লাগানো ছিলো। ফলে যানটি জল কেটে সাবমেরিনের মতো সামনে এগোতে পারতো। যানটি নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখার পর ১৯৫৪ সালে ফরাসী নৌ-বাহিনীর দুই অফিসার রওনা হয়ে পড়লেন সাগরের গভীরে। আফ্রিকার উপকূলে ভূমধ্যসাগরে তাঁরা ডুব দিলেন ৪ কিলোমিটার নিচে—চার্লস বীবি যতো গভীরে ডুব দিতে পেরেছিলেন তার চার গুণ!

ভাইকে সঙ্গে নিয়ে পিকার এরপর দ্বিতীয় ব্যাথিস্কেফ তৈরি করলেন, নাম 'ত্রিয়েস্ত্'। যানটির ওজন হলো ১০ টন। ১৯৪৮-এ মার্কিন নৌ-বাহিনী সেটি কিনে নেয়। অগাস্ত্ পিকার-এর পুত্র জ্যাকস্ পিকার এবং মার্কিন নৌ-বাহিনীর এক অফিসার ডন ওয়াল্‌শ্ ১৯৬০ সালে 'ত্রিয়েস্ত'-এ চড়ে ডুব দেন প্রশান্ত মহা-সাগরে। ম্যারিয়ানাস্ টেঞ্চ হলো প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর অংশ—এর গভীরতা ১১ কিলোমিটারেরও বেশি। ম্যারিয়ানাস্ দ্বীপপুঞ্জের 'গুয়াম' থেকে ৩৩৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত

এই অতল খাদ। সেই খাদে দুই অসমসাহসী ঝাঁপ দিলেন। স্পর্শ করলেন প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম তলদেশ। স্থাপিত হলো সর্বকালের এক বিশ্বরেকর্ড। ব্যাথিস্কেফ-এর কাছে খোলা বইয়ের পাতার মতো প্রকাশিত হতে লাগলো রহস্যময় গভীর সাগরের গোপন কথা।

সুতরাং জলের তলায় বিচরণের সাধ মানুষের সফল হলো প্রায় ৩৫০ বছরের সাধনায়! সাবমেরিন তৈরি করে মানুষ রোপণ করে-ছিলো ধ্বংসের ইঙ্গিত, কিন্তু 'ব্যাথিস্কেফ' হয়তো মানুষের পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের সহযোগী হয়ে নিয়ে আসবে নতুন সৃষ্টির ইশারা।

——

হাওয়া-কলের কথা উঠলেই প্রথমে মনে পড়তে পারে ডন কুইক-জোট-এর কাহিনী। স্পেনের সাহিত্যিক মিগুয়েল দ্য সাভাথরা সারভাঁতে-এর লেখা 'ডন কুইকজোট' উপন্যাসের পাগল নায়ক ডন কুইকজোট তার রোগা লিকলিকে ঘোড়া রোজিনাঁতেকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়েছিলো নানান অভিযানে। নিজেকে সে একজন সাহসী যোদ্ধা কল্পনা করতো, আর যুদ্ধ করে বেড়াতো কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে। হাওয়া-কলের সঙ্গে ডন কুইকজোট জড়িয়ে থাকার কারণটি কিন্তু ভারি অদ্ভুত! একবার এই পাগল নায়ক বর্শা উঁচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তেড়ে গিয়েছিলো তার ভয়ঙ্কর শত্রুকে আক্রমণ করতে। সে শত্রু আর কেউ নয়, কয়েকটি উইণ্ডমিল, অর্থাৎ হাওয়া-কল। ১৬০৫ সালে 'ডন কুইকজোট' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। জেলে বসে উপন্যাসটি শেষ করেছিলেন মিগুয়েল সারভাঁতে। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই একটি আপ্তবাক্য চালু হয়ে গিয়েছিলো ইংরেজীতেঃ হাওয়া-কলের সঙ্গে যুদ্ধ করা। অর্থাৎ কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা। এই প্রসঙ্গে হয়ত মনে পড়বে অদ্ভুতুড়ে রসিক লেখক সুকুমার রায়ের ছড়ার একটি লাইন ঃ 'ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা'।

হাওয়া-কলের সঙ্গে লড়াই নিয়ে তো অনেক কথা হলো। কিন্তু শুনলে কি বিশ্বাস হবে, 'ডন কুইকজোট' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৩৮০ বছর পরেও মানুষ হাওয়া-কলের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে! এ লড়াই কিন্তু সত্যিকারের লড়াই। কিভাবে হাওয়া-কলকে আমাদের নিত্যদিনের কাজে লাগানো যায় তারই লড়াই। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই লড়াই? এর উত্তরটা কিন্তু খুব কঠিন নয় মোটেই। হাওয়া-কল থেকে আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করতে চাই। এমনিতে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ তৈরি করতে আমাদের জ্বালানী হিসেবে লাগে তেল ও কয়লা। এ দুটোই হলো প্রাকৃতিক খনিজ জ্বালানী। ফলে একদিন না একদিন এগুলো শেষ হবেই। তখন কি করবে মানুষ?

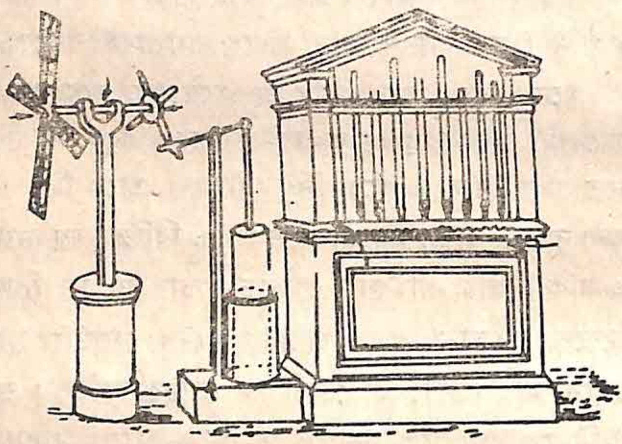
এই সমস্যা সমাধান করতে নানান চেষ্টা আমরা শুরু করে দিয়েছি বহুদিন ধরেই। যেমন পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি, কিংবা সূর্যের তাপ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির চেষ্টা, কখনও বা সমুদ্রের ঢেউয়ের শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি আর কখনও বা বাতাসকে। সেই চেষ্টা থেকেই প্রাচীন হাওয়া-কলকে আধুনিক সাজে সাজিয়ে আমরা তাকে নতুনভাবে কাজে লাগানোর মতলব ভাঁজছি।

হাওয়া-কল জিনিসটা দেখতে অনেকটা সিলিংফ্যানের মতো। তবে সেটা ঝুলিয়ে না দিয়ে খাড়া করে বসানো হয়। হাওয়া বইলেই পাখার ব্লেডগুলো ঘুরতে শুরু করে। আর সেই ঘুরন্ত পাখার সঙ্গে বেল্ট, পুলি ইত্যাদি লাগিয়ে আমরা যে কোনও জিনিসকে ঘোরাতে পারি। তারপর তা থেকে আদায় করা যেতে পারে নানান কাজ।

ঘুরন্ত পাখা থেকে কাজ আদায় করার ব্যাপারটা হয়তো একটু ঘোরালো মনে হতে পারে। যদি তা মনে হয়, তবে প্রশ্ন করি, বৈদ্যুতিক মোটর কি করে? সে ত শুধুই ঘোরে! তবুও তার কাছ থেকে কতো কাজ আদায় করে নিই আমরা। তাকে দিয়ে পাম্প চালিয়ে জল তুলতে পারি, গম ভাঙাতে পারি, বিভিন্ন যন্ত্র চালাতে পারি; এমনকি মিক্সার, গ্রাইণ্ডার, কাপড় কাচার যন্ত্র, সব কিছুতেই মোটর রয়েছে। এছাড়া রেকর্ড প্লেয়ার বা টেপ রেকর্ডারের কথাও ভুললে চলবে না! সেখানেও বৈদ্যুতিক মোটর হাজির! সুতরাং কোনও জিনিসকে ঘোরাতে পারলেই তা থেকে কাজ আদায় করে নেওয়াটা তেমন কঠিন কাজ নয়। বৈদ্যুতিক মোটর ঘোরাতে লাগে বিদ্যুৎ। আর হাওয়া-কলকে ঘোরাতে দরকার হয় হাওয়ার তেজ। বাতাস যতো জোরে বইবে, হাওয়া-কল ঘুরবেও ততো জোরে। যেমন, ফুরফুরি বা ঘূর্ণি নামে একটা খেলনা আমাদের সবারই দেখা। একটা সরু কাঠির মাথায় একটা রঙীন কাগজের পাখা লাগানো। কাঠিটি শক্ত মুঠোয় ধরে ছুট লাগালেই কাগজের পাখাটা বনবন করে ঘুরতে শুরু করে। অর্থাৎ হাওয়ার ধাক্কার জোর যতো

বাড়বে, পাখাটিও ঘুরবে ততো জোরে। ঠিক যেন একটা খেলনার হাওয়া-কল।

হাওয়া-কল কবে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিলো তার নির্দিষ্ট কোনও সাল-তারিখ না পাওয়া গেলেও এটুকু জানা গেছে যে চীন ও জাপানে খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ সালে হাওয়া-কলের চলন ছিলো। কথিত আছে, ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাবি খ্রীস্টপূর্ব সপ্তদশ শতকে নিজের রাজ্যে জলসেচের কাজে হাওয়া-কল ব্যবহারের কথা ভেবেছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রযুক্তিবিদ হিরো একটা সহজ-সরল হাওয়া-কলের বর্ণনা করেছেন। অনুভূমিক একটি দণ্ডের সঙ্গে চারটি পাল লাগানো এই হাওয়া-কল ব্যবহার করে একটি অর্গান বাজানো হত।



অর্গান বাজানো হাওয়া-কল

পারস্যবাসীরা যে কতোদিন ধরে হাওয়া-কল ব্যবহার করছে তারও সঠিক হিসেব আমাদের হাতে নেই। তবে মদিনার এক পার্সী ক্রীতদাসের প্রচলিত কাহিনীতে হাওয়া-কলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ক্রীতদাস নাকি অভিযোগ করেছিলো খলিফা ওমরের কাছে। বলেছিলো, তার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে ছুটি করে রৌপ্যমুদ্রা কর নেওয়া হচ্ছে। অথচ সুলতানের কর্মচারীদের মতে, ক্রীতদাসটি ছিলো

একজন ছুতোর মিস্ত্রী, হাওয়া-কল তৈরি করতে ওস্তাদ। ফলে দুটি করে রৌপ্যমুদ্রা কর দেবার ক্ষমতা তার ছিলো।

দুর্ভাগ্যবশত এর বেশি আর কোনও খুঁটিনাটি পারস্যের হাওয়া-কল সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি। তবে সাতের দশকের মাঝামাঝি হাওয়া-কল তৈরিটা যে সে-দেশে বেশ প্রচলিত পেশা ছিলো তার বহু প্রমাণ খুঁজে পাওয়া গেছে।

মিশরে হাওয়া-কলের ব্যবহার চালু হয় আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১০০ সাল নাগাদ। পরে পারস্য হয়ে এই যন্ত্রটির ব্যবহার শুরু হয় ইওরোপে।

আজকের হাওয়া-কল গঠনপ্রণালীর দিক থেকে অনেক উন্নত; সেই তুলনায় চীন ও পারস্যের হাওয়া-কলগুলো ছিলো নিতান্তই হাতুড়ে যন্ত্র। কিন্তু কর্মক্ষমতা যতো কমই হক, এটা সত্যি যে, যন্ত্রগুলো দিয়ে তখনকার মানুষরা মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিতো। তাছাড়া হাওয়ার শক্তিটুকু যখন প্রকৃতি থেকে নিখরচায় পাওয়া যাচ্ছে, তখন হাওয়া-কল যতো কম কাজই করুক না কেন, যেটুকু কাজ মানুষ তার কাছ থেকে পেতো, সেটুকুই ছিলো লাভ। কিন্তু আজকের এই শক্তি-সংকটের যুগে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য প্রকৃতির শক্তি থেকে যতো বেশি সম্ভব কাজ নিংড়ে নেওয়া। তাই হয়ত উন্নত থেকে উন্নততর যন্ত্র তৈরির চেষ্টায় আমরা মেতে উঠেছি।

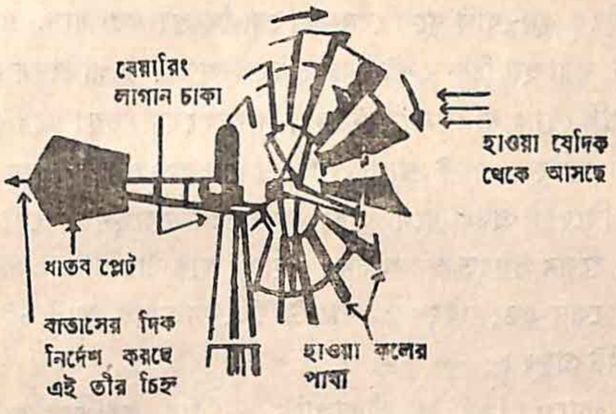
ইওরোপে হাওয়া-কলের ব্যবহার শুরু হয় ১১০০ সালের পর। কারও কারও মতে পশ্চিমের দেশগুলোতে হাওয়া-কলের প্রচলনের মূলে ছিলো যুদ্ধজয়ী সৈনিকেরা। মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ থেকে স্বদেশে ফিরে তারা হাওয়া-কল চালু করে। ইওরোপের হাওয়া-কলগুলো তৈরি হয় অনুভূমিক অক্ষদণ্ডের সঙ্গে ব্লেড লাগিয়ে। কিন্তু যতদূর জানা যায়, মধ্য প্রাচ্যের কলগুলো ছিলো উল্লম্ব অক্ষদণ্ডের সাহায্যে তৈরি। অনেকটা সেইরকম চেহারার হাওয়া-কল এক সময় চীনদেশে ব্যবহার করা হতো।

অনুভূমিক অক্ষের যে-সব হাওয়া-কল প্রথমে চালু হয়,

সেগুলোতে কাঠের কাঠামোর ওপরে ক্যাম্বিশের পাল লাগানো থাকতো। যাতে কাঠামোটা পালের ওজন বইতে পারে সে-জন্য অক্ষটাকে পুরোপুরি অনুভূমিক না করে সামান্য উর্দ্ধমুখী করে রাখা হতো। এ-সব হাওয়া-কলের একটা অসুবিধে ছিলো। হাওয়ার দিক পালটে গেলে হাওয়া-কলের গতি যেতো কমে। হাওয়া যেদিক থেকে বইছে, সরাসরি সেদিকে মুখ করে থাকলেই হাওয়া-কল বেশি শক্তি পাবে এবং সবচেয়ে জোরে ঘুরবে। সুতরাং হাওয়ার দিক পালটে গেলেই হাওয়া-কলের মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া-দরকার। পুরনো ধরনের কলে এই কাজটি করতে হতো মানুষকে। গোটা কলটিকে ধরে ঘুরিয়ে বসিয়ে দিতো সে। সন্দেহ নেই, বেশ পরিশ্রমের কাজ! পরে অবশ্য এমন কায়দায় নতুন ধরনের হাওয়া কল তৈরি হলো, যে কলটা নিজে থেকেই সব সময় ঘুরে যাবে বাতাসের গতি মুখ বরাবর। এধরনের কল প্রথম তৈরি হয় সম্ভবত জার্মানীতে। ইতালির প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি একটি ছ'পালওয়ালা হাওয়া-কলের নকশা এঁকে গিয়েছিলেন তাঁর নোটবইতে।

নথিপত্রে যে হিসেব পাওয়া যায় তাতে ইংল্যাণ্ডে হাওয়া-কলের প্রথম চলন হয় ১৯১১ সালে। সেখানে প্রচলিত হাওয়া-কল মোটা-মুটি দুরকমের: টাওয়ার-মিল এবং পোস্ট-মিল। পোস্ট-মিল-এর কাঠামো ওক কাঠের তৈরি, তবে ভারী কাঠামোটি দাঁড় করানো থাকে ইট-চুনের গাঁথুনির ওপর। কাঠের কাঠামোর ওপর দিকে থাকে বিভিন্ন ধাতব যন্ত্রাংশ। আর তারও ওপরে থাকে পাল লাগানো হাওয়া-কলের পাখা। বাতাসের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া-কলটিও যাতে স্বচ্ছন্দে ঘুরে যেতে পারে সেজন্য পালওয়ালা চক্রটি বসানো থাকে বল-বেয়ারিং জাতীয় একটি চাকার ওপরে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলটিও যাতে মসৃণভাবে ঘুরতে পারে তার জন্য হাওয়া-কলের পেছনদিকে একটা বড় ধাতব প্লেট লাগানো থাকে। প্লেটটা এমন ভাবে বসানো হয় যাতে সবসময় সেটা হাওয়ার গতির দিকে মুখ করে থাকতে পারে। হাওয়ার স্রোতের সামান্য হেরফের

হলেই সেই ধাতব প্লেটে হাওয়া এসে আঘাত করে। সেই আঘাতে বেয়ারিং-এর ওপরে বসানো পাখাসমেত হাওয়া-কলের মুণ্ডুটাই যায় ঘুরে। যতক্ষণ না পর্যন্ত পেছনের প্লেট আবার হাওয়ার গতির দিক



নির্দেশ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত হাওয়া-কলের মাথা ঘুরতেই থাকে। অনেকটা যেন বাতাসের দিক নির্ণয় যন্ত্র।

টাওয়ার-মিলের কাঠামো মূলত ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি। এই মিলের মাথাটা একটা টুপির মতো অংশ। এর ওপরেই বসানো থাকে হাওয়া-কলের পাখা। বাতাসের দিক পরিবর্তনের সময় টুপির মতো অংশটি পাখাসমেত ঘুরে যায়। টাওয়ার-মিলের চেহারা অনেকটা টাওয়ার বা মিনারের মতো হওয়ার ফলে এর মধ্যে জায়গা পাওয়া যায় অনেক বেশি। কোনও কোনও সময় ঘর-বাড়ির মতো দু-তিনটে তলাও থাকে এর ভেতরে। তবে বাইরে থেকে শুধু ঘুরন্ত পাখাগুলো ছাড়া ভেতরের যন্ত্রপাতি কিছুই দেখা যায় না।

পোস্ট-মিল বা টাওয়ার-মিলে সাধারণত চারটি করে পাখা থাকে। তবে তার চেয়ে বেশি পাখাও অনেক হাওয়া-কলে ব্যবহার করা হয়। আর পাখার নকশাও করা হয়েছে বহুরকম। এলোমেলো বাতাস বইলে হাওয়া-কলের গতিও হয়ে পড়বে এলোমেলো। অথচ ঠিক ঠিক কাজ পাওয়ার জন্য কলটা একটা সুনির্দিষ্ট গতিতে ঘোরা দরকার।

সেই কারণেই এমন সব ধরনের পাখা তৈরি হতে লাগলো যা বাতাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এক একটা পাখা তৈরি করা হলো জানলার খড়খড়ির মতো অসংখ্য ছোট ছোট পাখা দিয়ে। ছোট ছোট পাখাগুলো আবার ইচ্ছে মতো নড়তে চড়তে পারে। জানলার খড়খড়িকে কম-বেশি খুলে যেমন হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এখানেও কাজটি করা হয় ঠিক সেই রকম। ফলে বাতাসের গতিবেগ যতোই কম-বেশি হোক না কেন ছোট ছোট পাখাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে হাওয়া-কলের গতিকে একই রাখা সম্ভব হয়। হাওয়া-কল নিয়ে যেসব প্রযুক্তিবিদেরা প্রথম যুগে প্রচুর মাথা ঘামিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন সম্ভবত জন স্মীটন। এছাড়া আর যাঁদের নাম করা যায়, তাঁরা হলেন এণ্ড্ মাইকেল, ক্যাপ্টেন স্টিফেন হুপার, স্যার উইলিয়াম কিউবিট প্রমুখ।

ইংল্যাণ্ডে হাওয়া-কল ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার সহজ ব্যবহারের জন্য। একটা হিসেব থেকে জানা যায়, এক সময়ে সেখানে প্রায় ১০ হাজার হাওয়া-কল চালু ছিলো। ইংল্যাণ্ডের বড়সড় হাওয়া-কলগুলোর ক্ষমতা ছিলো ৩০ থেকে ৪০ অশ্বশক্তি। আর কোনও কোনও টাওয়ার-মিলের পাখা ছিলো প্রায় ১২ মিটার লম্বা। এই কলগুলো দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শস্য ভাঙানো হতো বা জল নিষ্কাশন করা হতো।

ইওরোপের অন্যান্য যে সব দেশে হাওয়া-কল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক। ডেনমার্কে হাওয়া-কল নিয়ে গবেষণায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন অধ্যাপক পি লা ক্যুর। ডেনমার্কের অ্যাস্কভ-এ তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি হাওয়া-কল তৈরিও করেছিলেন।

ইওরোপ থেকে হাওয়া-কল ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিলো আমেরিকা ও রাশিয়ায়।

আমেরিকায় প্রথম হাওয়া-কল তৈরি হয় ১৬২১ সালে। ভার্জিনিয়ায় সেটি চালু করা হয় রাজ্যপাল জর্জ ইয়ার্ডলির উদ্যোগে। এর

প্রায় ২৫০ বছর পরে আমেরিকান কায়দায় প্রথম হাওয়া-কল তৈরি করেন ড্যানিয়েল হ্যালিডে। তখন থেকেই কাপড়ের পালের বদলে কাঠের ব্লেড ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৮৩ সাল নাগাদ ধাতব ব্লেড কাঠের জায়গা নিতে শুরু করে। আজও এ-রকম হাওয়া-কল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়াতে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার হাওয়া-কল সাধারণত চাষবাসের জলসেচের কাজে সাহায্য করে। এমন একটা হাওয়া-কলের ক্ষমতা কতোটুকু সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে একটা উদাহরণ দিলেই। ধরা যাক, ৩০ মিটার গভীর একটা কুয়ো আছে। আর একটা হাওয়া-কল রয়েছে যার পাখার ব্যাস আড়াই মিটার। যদি ২০ মিটার উঁচু টাওয়ারের মাথায় এই হাওয়া-কলটা বসানো থাকে তাহলে তা দিয়ে এক বছরে প্রায় ২৭ লক্ষ লিটার জল পাম্প করা সম্ভব! এ থেকে নিশ্চয়ই আঁচ করা যায় হাওয়া-কলের ক্ষমতা একেবারে ফ্যালনা নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ৫০ বছরে মানুষের চেষ্টা ছিলো হাওয়া-কলের ক্ষমতাকে দু-ভাবে কাজে লাগানো। প্রথমত, এর শক্তি মারফৎ বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। আর দ্বিতীয়ত, হাওয়া-কল থেকে বিদ্যুৎ তৈরির চেষ্টা। রাশিয়াতে এ-ধরনের চেষ্টা খুব জোরদার হয়েছিলো। কারণ সেখানে কৃষি এলাকা প্রচুর এবং সেগুলো পরস্পরের কাছ থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় শক্তি জোগানোটা একটা ভীষণ সমস্যা ছিলো। এই সমস্যার সমাধান করতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে পরেই একটা সরকারী সংস্থা গঠিত হয় রাশিয়াতে। নাম, সেণ্ট্রাল উইণ্ড পাওয়ার ইন্সটিটিউট অফ মস্কো। এদেরই চেষ্টায় ১৯৩১ সালে তৈরি হলো একটা ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র—যা বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে চালাতে সাহায্য করে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিলো ক্রিমিয়ার কাছাকাছি।

হাওয়া-কল থেকে বিদ্যুৎ? শুনে কি কোনও খটকা লাগছে? কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কোনও কারণই নেই। এমনিতে তাপবিদ্যুৎ

কেন্দ্রে কিভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হয়? বাষ্প দিয়ে ঘোরানো হয় একটি টারবাইনকে। খুব সহজ করে টারবাইনের চেহারাটা বুঝিয়ে বলা যাক। একটা লম্বা অক্ষদণ্ডের চারদিকে কয়েকটা বাটি চক্রাকারে লাগানো থাকে। তারপর খুব বেশি চাপের বাষ্প সরু সরু নলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা মারে সেই বাটিগুলোতে। যেহেতু বাটিগুলো সব একই দিকে মুখ করে থাকে সেহেতু বাষ্পের ধাক্কায় বাটি লাগানো চাকাটা বনবন করে ঘুরতে থাকে। এই চাকার কেন্দ্রে লাগানো রয়েছে অক্ষদণ্ড। অতএব সেটাও ঘোরে একই সঙ্গে। ব্যস, সংক্ষেপে এটুকুই হলো টারবাইনের কাজ।

আমরা জানি, বিদ্যুৎ তৈরি করতে গেলে জেনারেটার লাগে। এখন তো লোডশেডিংয়ের দৌলতে ছোট-বড় জেনারেটার আমরা আকছার দেখছি। জেনারেটারের প্রধান অংশ দুটো। একটা হলো স্ট্যাটর, আর দ্বিতীয়টি হলো রোটর। স্ট্যাটর থেমে থাকে। রোটর ঘোরে। দুটো অংশেই থাকে তারের কুণ্ডলী। স্ট্যাটরের (কিংবা রোটরের) তারের কুণ্ডলীতে প্রবাহ পাঠিয়ে তাকে তড়িৎ চুম্বক করে তোলা হয়। তখন যদি রোটরের কুণ্ডলীটিকে বনবন করে ঘোরানো যায় তাহলে রোটরের কুণ্ডলী থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বিজ্ঞানী ফ্লেমিং-এর 'ডান হস্ত সূত্র' অনুযায়ী।

জেনারেটার সম্পর্কে এতো কথা শুনে মনে হতে পারে, যে সব জেনারেটার আমরা সচরাচর দেখে থাকি তাতে বাষ্পই বা কোথায় আর টারবাইনই বা কোথায়! আসলে সেগুলোয় বাষ্প বা টারবাইন কোনওটাই নেই। সেই কাজগুলো করছে পেট্রল এঞ্জিন বা ডিজেল এঞ্জিন। কি কাজ? না জেনারেটারের রোটরকে ঘোরানো। সেটাই তো একমাত্র কাজ। বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বাষ্প ও টারবাইন ব্যবহার করা হয়, কারণ তাতে এঞ্জিনের চেয়ে খরচ কম পড়ে। এবারে নিশ্চয় আন্দাজ করা যাচ্ছে হাওয়া-কল থেকে বিদ্যুৎ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ, টারবাইনের বদলে স্রেফ হাওয়া-কলটি রোটরের অক্ষদণ্ডের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া! তখন হাওয়া-কল ঘুরলেই

অক্ষদণ্ড ঘুরবে, ঘুরবে রোটর, এবং পাওয়া যাবে বিদ্যুৎ। অবশ্য হাওয়া-কলের সঙ্গে গীয়ার-পিনিয়ান ইত্যাদি যন্ত্রাংশ জুড়ে দেওয়া হয় রোটরের আবর্তনের হার বাড়ানোর জন্য।

সুতরাং বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের চেষ্টায় হাওয়া-কল যে ভীষণ কাজে লাগবে তাতে আর সন্দেহ কি! ১৯৫৪ সালের এক খবরে জানা যায় রাশিয়ায় হাওয়া-কল চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা তখন ছিলো ২৯,৫০০! আর তা থেকে মোট পাওয়া যেতো ১,৬৭,০০০ অশ্বশক্তি!

গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে ফ্রান্স এবং আমেরিকা একই চেষ্টা শুরু করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার ভারমণ্ট-এ তৈরি হয় হাওয়া-কল চালিত ১২৫০ কিলোওয়াটের একটি জেনারেটার। তার পর থেকে বিদ্যুৎ তৈরির এই নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নানা দেশে জোর কদমে গবেষণা এগিয়ে চলেছে। সব কিছু দেখে শুনে কি মনে হয় না, আমাদের ভারতে হাওয়া থেকে ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ ধরবার চেষ্টা করলে মন্দ কি! তাহলে অন্তত পরীক্ষার সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মোমবাতি বা লণ্ঠন জ্বেলে কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হয় না!

দ্যল্যাম্বার পৃথিবীর পরিধির যে মাপ নির্ণয় করেন তা ফার্নেলের সঙ্গে একরকম মিলে যায়। এছাড়া অন্য আরো যে-সব বিজ্ঞানী এই পৃথিবী মাপার কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন জ্যঁ পিকার, জ্যঁ ডমিনিক ক্যাসিনি, অ্যাণ্ডার্স সেলসিয়াস ও আরো অনেকে।

এর পরবর্তীকালে একই কাজে যুক্ত হয়েছে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর নাম: জ্যঁ ব্যাপতিস্ত্ বিয়ো, ডমিনিক আরাগো, লাপলাস, গাউস, বেসেল্ ইত্যাদি। ফলে পৃথিবীর মাপ নির্ভুল থেকে নির্ভুলতর হয়েছে। এবং ইরাটোস্থিনিজ পেয়েছেন তাঁর উপযুক্ত সম্মান।

এতো কর্মকাণ্ডের ঘটনা জানার পর মনে হয়, সত্যিই 'মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।' শুধু বুদ্ধি, পরিশ্রম ও দক্ষতা—এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়ে যে-কোনও অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলতে পারে মানুষ।

সময়টা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। ঘটনাস্থল ইংল্যাণ্ড। লোকসভা বসেছে। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জনৈক মহান বিজ্ঞানী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যাঁকে লোকসভায় পেয়ে অন্যান্য সদস্যরা গর্বিত ও সম্মানিত। তবে কখনওই এই মহান বিজ্ঞানীকে কোনও বক্তব্য রাখতে শোনা যায়নি। শুধুই যেন নিরঙ্কুশ শ্রোতা। কিন্তু আজই ঘটলো তার ব্যতিক্রম। কিছু বলতে চান, এই ইশারায় হঠাৎই উনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সভা চঞ্চল হয়ে উঠলো মুহূর্তে। সদস্যদের মধ্যে শুরু হলো চাপা গুঞ্জন। এতোদিন পরে সময় এসেছে। এসেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। অমূল্য কোনও বক্তব্য রাখতে চলেছেন বিশ্বনন্দিত এই বিজ্ঞানী। লোকসভা আজ সম্মানিত হবে নতুন সম্মানে। সকলেই উৎসুক চোখে তাকালেন সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির দিকে: কাঁধ পর্যন্ত কোঁকড়ানো সাদা চুল, তীক্ষ্ণ নাক, অন্তর্ভেদী চোখ, অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তির ইঙ্গিতবাহী সুচারু আঙুল।

উৎকণ্ঠিত পরিবেশের উৎকণ্ঠা আরও শতগুণে বাড়িয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী সম্রাট। শান্ত অথচ স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'উত্তরের জানালাটা দয়া করে কি বন্ধ করে দেবেন? ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।' কথা শেষ করে আবার আসন গ্রহণ করলেন তিনি।

সেদিন লোকসভার সদস্যরা যে কি পরিমাণ হতাশ হয়েছিলেন তা বোধহয় কোনও যন্ত্রে মাপা সম্ভব ছিলো না। বেশ কয়েক বছর তিনি সদস্য ছিলেন লোকসভার, কিন্তু ঐ একবারই নিজের বক্তব্য রেখেছিলেন সভার কাছে।

এবারে দ্বিতীয় ঘটনায় আসা যাক। ১৬৯৪ সালের মে মাস। সেণ্ট জন্স্ কলেজের চারজন 'ফেলো' গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনার বিষয়বস্তু: কলেজের উলটোদিকের বাড়িটায় ভূত আছে কি নেই। বাড়ির মালিক ভ্যালেন্টিন অস্টিন নামে জনৈক ভদ্রলোক। এবং তার ধারণা বাড়িটা নাকি ভুতুড়ে। সত্যিই ভুতুড়ে কিনা, সেটা যাচাই করার দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন সেণ্ট জন্স্

যাঁরা সত্যিই এ প্রশ্নের উত্তরটা জানেন তারা হয়তো ভয়ে মুখ খুলবেন না। ভয়ের কারণ, উত্তরটি বলা মাত্রই তো পরবর্তী প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেওয়া হবে ঃ কি করে আয়তনটা মাপলেন যদি দয়া করে একটু বলেন! না, এর উত্তরে নিশ্চয়ই বলা যাবে না, 'সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইতে পড়েছি, পরিষ্কার লেখা আছে, পৃথিবীর আয়তন প্রায় এক লক্ষ আট হাজার তিনশো কোটি ঘন কিলোমিটার। অতএব মাপামাপির প্রশ্ন বাদ দিন!'

মাপামাপির প্রশ্ন যে বাদ দেওয়া যাবে না তার কারণ পৃথিবীর চেহারা গোল এই তথ্যটুকু জানার পরেও মানুষের মোটামুটি ২০০০ বছর সময় লেগেছে পৃথিবীর সঠিক আয়তনটুকু মাপতে। এটা জেনে কেউ কেউ নিশ্চয়ই অবাক হবেন, কিন্তু অবাক হলেও কিছু করার নেই। যে গোলকের গড় ব্যাস প্রায় ১৩,০০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি তাকে মেপে ফেলাটা তো আর চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তা সেই 'বিশাল' ব্যাপারেরই একটু-আধটু খোঁজখবর নেওয়া যাক।

পৃথিবী যে গোল এটা জানার পরই মানুষের মনে জেগে উঠলো একটাই জিজ্ঞাসা ঃ পৃথিবী গোল সে-তো বোঝা গেলো, কিন্তু মাপে কতো বড়? পৃথিবী যদি থালার মতো চ্যাপ্টা হতো, তাহলে পায়ে হেঁটে ঘাম ঝরিয়ে সেটা সরাসরি আদ্যোপান্ত মেপে ফেলা ছাড়া মানুষের আর কোনও পথ ছিলো না। কিন্তু কপাল ভালো, পৃথিবী গোল—অর্থাৎ একটি গোলক। কোনও গোলক আকারে ছোট কিংবা বড় হলে তার তলের বক্রতা বেশি কিংবা কম হয়। অতএব বক্রতা থেকেই পরোক্ষভাবে কোনও গোলকের মাপ বের করা সম্ভব।

পৃথিবী যদি আকারে সেরকম প্রকাণ্ড হতো তাহলে তার তলের বক্রতা ভীষণ নগণ্য হতো। সহজে সেটা হয়তো ধরাই পড়তো না মানুষের চোখে। উত্তর-দক্ষিণে কয়েকশো মাইল এগিয়ে গেলে আকাশের জ্বলজ্বলে তারাগুলোর অবস্থানের তেমন কোনও হেরফের ঘটতো না; নতুন তারাও দেখা যেতো না দিগন্তে। কিন্তু কার্যত

সেটাই ঘটে থাকে। ফলে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পৃথিবীর তলের বক্রতা নিতান্ত নগণ্য নয়।

আরো একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। পৃথিবী যে গোল তার প্রমাণ হিসেবেও এই উদাহরণটা আমরা প্রায়ই দাখিল করে থাকি। ধরুন, আপনি সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং একটি জাহাজ নোঙর তুলে রওনা হয়ে ক্রমে এগিয়ে চলেছে গভীর সমুদ্রের দিকে। কিছুক্ষণ পরেই আপনি লক্ষ করবেন, জাহাজের খোলের কিছুটা অংশ আপনার চোখের আড়ালে চলে গেছে ; অথচ মাস্তুল ইত্যাদি সমেত জাহাজটির ওপরের অংশটুকু বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। আরও কিছু সময় পরে জাহাজের নিচের দিকের আরও কিছু অংশ অদৃশ্য হয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে আপনার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায় জাহাজের মাস্তুল এবং ফলত গোটা জাহাজটি। না, আকারে ক্রমশ ছোট হতে হতে অবশেষে বিন্দুর আকার নিয়ে জাহাজটি মিলিয়ে যায়নি। বরং বেশ বড়সড় দৃশ্যমান থাকতে থাকতেই লুকিয়ে পড়েছে সমুদ্রের আড়ালে। বুঝতেই পারছেন, এ রকম 'অলৌকিক' ঘটনার জন্য আসলে দায়ী সমুদ্র-পৃষ্ঠের বক্রতা—অর্থাৎ পৃথিবী-পৃষ্ঠের বক্রতা।

ঠিক একই কারণে চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর যে ছায়া চাঁদের ওপরে পড়ে তার বক্রতা মানুষের স্পষ্ট নজরে পড়েছিলো। পৃথিবী যদি আকারে অতি বিশাল হতো তাহলে তার ছায়ার বক্রতা এতো কম হতো যে সেটাকে প্রায় সরলরেখা বলেই মনে হতো।

অতএব এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেই মানুষ হলফ করে বলতে পেরেছিলো, পৃথিবী মাপে বেশ বড় তাতে সন্দেহ নেই, তবে সে-রকম একটা প্রকাণ্ড কিছু নয়। কিন্তু এই 'বেশ বড়' মাপের বস্তুটিকেই বা মাপা যাবে কেমন করে ? খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গ্রীক ভূগোল-বিদরা কিন্তু এর মোটামুটি একটা উত্তর আঁচ করতে পেরেছিলেন। অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা জানতেন, পশ্চিমদিকে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়েও কঠিন জমির দেখা মেলে, আর পূর্বদিকে ভারতবর্ষের

পরেও পৃথিবী বিস্তৃত।

এইভাবে পুব-পশ্চিমের যেটুকু হদিশ তাঁরা করেছিলেন তার দূরত্ব মোটামুটিভাবে ১০,০০০ কিলোমিটার। ১০,০০০ কিলোমিটার পার হয়েও যখন পৃথিবীকে সম্পূর্ণ পাক দেওয়া সম্ভব হয়নি তাহলে পৃথিবী নামক গোলকটির পরিধি ১০,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি! কিন্তু কতো বেশি সেটা গ্রীক বিজ্ঞানীরা তখন আঁচ করতে পারেননি। পেরেছিলেন অনেক অনেক পরে।

পৃথিবীর পরিধি মাপার প্রথম খবর পাওয়া যাক গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিদিসের লেখায়। তিনি তাঁর সমকালীন কয়েকজন লেখকের কথা উল্লেখ করে বলেন যে তাঁদের লেখায় পাওয়া গেছে, পৃথিবীর পরিধি তিন লক্ষ '**স্টাডিয়া**'। সে-সময়ে গ্রীসে দূরত্ব মাপার একক ছিলো '**স্টাডিয়া**।' এখনকার হিসেবে ১০ '**স্টাডিয়া**' প্রায় ১৮০০ মিটারের সমান। অতএব আর্কিমিদিসের উল্লেখ অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধির মাপ মোটামুটি ৫৪,০০০ কিলোমিটার।

আর্কিমিদিসের প্রিয় বন্ধু ছিলেন আর এক গ্রীক বিজ্ঞানী ইরাটোস্থিনিজ। খ্রীস্টপূর্ব ২৭৬ অব্দে ইরাটোস্থিনিজ-এর জন্ম। পৃথিবী মাপার ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো এই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর। একাধিকবার নানাভাবে তিনি পৃথিবীর পরিধি মাপার চেষ্টা করেছিলেন। আর্কিমিদিস তাঁর লেখায় 'পৃথিবী মাপিয়ে লেখক-বিজ্ঞানীদের' নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইরাটোস্থিনিজ। খ্রীস্টপূর্ব ২৩০ অব্দে যে প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন, পাঁচ বছর পরে সে-কথারই হয়তো উল্লেখ করেছিলেন আর্কিমিদিস।

তাঁর সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ছিলেন ইরাটোস্থিনিজ। তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তরা তাঁকে 'দ্বিতীয় প্লেটো' নাম আখ্যা দিয়েছিলেন। এছাড়া একটা অদ্ভুত ডাকনাম ছিলো এই এই বিজ্ঞানীর: 'বিটা'। গ্রীক ভাষায় 'আলফা' শব্দটি বোঝায় 'এক' সংখ্যাটি এবং 'বিটা' শব্দটির অর্থ 'দুই'। অনেকের মতে ইরাটো-

স্থিনিজ ছিলেন তৎকালীন 'দ্বিতীয়' জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর ওরকম ডাকনাম দেওয়া হয়েছিলো। আবার অন্যান্যদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন তার নম্বর ছিলো 'দুই', এবং তা-থেকেই হয়তো ঐ বিচিত্র নামের উৎপত্তি।

ইরাটোস্থিনিজ-এর প্রতিভা ছিলো বহুমুখী। যে শাখাতেই তিনি মনোযোগ দিয়েছেন তাতেই 'দ্বিতীয়' শ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন সারা পৃথিবীতেই। তবে আজকের বিচারে প্রাচীন ভূগোলবিদ হিসাবে তিনিই ছিলেন এক নম্বর। সাহিত্যচর্চাতেও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন ইরাটোস্থিনিজ। কবিতা লেখা ছাড়াও গ্রীক কমেডির ওপরে একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনাগ্রন্থ লিখে যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন তিনি। এ-জাতীয় প্রতিভার জন্যেই তিনি আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান পদের দায়িত্ব পেয়েছিলেন, এবং দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ এসেছিলো তৃতীয় টলেমির কাছ থেকে। এবং টলেমি-র ছেলের গৃহশিক্ষক হিসেবেও ইরাটোস্থিনিজ কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন।

ইরাটোস্থিনিজ-এর প্রসঙ্গ থেকে তাঁর বন্ধু আর্কিমিদিসের প্রসঙ্গে আর একবারের জন্য ফিরে যাবো আমরা। কারণ পৃথিবীর পরিধি অনুমানের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা করেছিলেন আর্কিমিদিস নিজেই। গোটা বিশ্বকে যদি বালিকণা দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া যায় তাহলে মোট কতো সংখ্যক বালিকণা লাগবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পৃথিবীর পরিধির যে মাপ ধরেছিলেন আর্কিমিদিস সেটা ৩,০০,০০০ স্টাডিয়ার দ্বিগুণ—অর্থাৎ ১,০৮,০০০ কিলোমিটার। পরিধির মাপটি তিনি বেশি ধরেছিলেন একটি বিশেষ কারণে। আর্কিমিদিসের তখন লক্ষ্য ছিলো বিশাল বিশাল সব সংখ্যা নির্ণয় করা। ফলে বালিকণার সংখ্যা যেন কোনও রকমেই কম না হয়ে যায় সেদিকে তিনি দারুণ সতর্ক ছিলেন, এবং কার্যত পৃথিবীর পরিধির আনুমানিক মাপটিকে নিতান্ত খেয়ালেই দ্বিগুণ করে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভালো, বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীর পরিধি ৪০,০০০

কিলোমিটারের কাছাকাছি।

এর পরের প্রচেষ্টা আবার ইরাটোস্থিনিজ-এর। এই বিজ্ঞানীর নাম আজও স্মরণযোগ্য প্রধানত একটি মাত্র কারণেঃ আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২৪০ অব্দে ইরাটোস্থিনিজ পৃথিবীর পরিধির যে মাপ নির্ণয় করেন তার সঙ্গে আজকের দিনের অতি-আধুনিক মাপের গরমিল শতকরা মাত্র ০'৪ ভাগ! আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ইরাটোস্থিনিজ তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদা পাননি। ভাবতে অবাক লাগে, সে-যুগের নীচুমানের যন্ত্রপাতি দিয়ে এরকম প্রায়-নির্ভুল উত্তর কেমন করে বের করেছিলেন তিনি!

আমরা জানি, দুপুরবেলা সূর্য যখন মাথার ওপরে থাকে তখন ছায়া সবচেয়ে ছোট হয়। যদি মাটিতে একটা লাঠি খাড়াভাবে পুঁতে দেওয়া হয়, তাহলে তার ছায়া পড়ে খুব ছোট মাপে। কিন্তু সূর্য যদি সরাসরি মাথার ওপরে থাকে তাহলে লাঠির কোনও ছায়াই দেখতে পাবো না আমরা। ইরাটোস্থিনিজ জানতেন, ২১ জুন মিশরের সিয়েন শহরে—যার আধুনিক নাম আসোয়ান—সূর্য ঠিক মাথার ওপরে থাকে। অর্থাৎ, কোনও লাঠি উল্লম্বভাবে পুঁতে দিলে তার কোনও ছায়া পড়ে না। অথচ সিয়েন থেকে ৫০০ মাইল বা ৮০০ কিলোমিটার উত্তরে আলেকজান্দ্রিয়ায় সরে এলে দেখা যায় একই লাঠির একটা খাটো ছায়া পড়ে। পরীক্ষা করে ইরাটোস্থিনিজ দেখলেন, আলেকজান্দ্রিয়ায় সূর্য ঠিক সরাসরি মাথার ওপরে থাকে না। বরং সাত ডিগ্রিরও কিছু বেশি হেলে থাকে দক্ষিণে। সন্দেহ নেই, পৃথিবী-পৃষ্ঠের বক্রতার জন্যেই দু-শহরে এই ছায়ার তফাৎ। সিয়েন শহরে খাড়া লাঠিটা সূর্য-মুখী বটে, কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় তা নয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠের বক্রতা যতো বাড়বে, ততোই আলেকজান্দ্রিয়ায় দীর্ঘতর হবে লাঠির ছায়া। পৃথিবীকে একটা সম্পূর্ণ পাক দিলে মোট ৩৬০ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়—কারণ পৃথিবী গোল। সুতরাং, 'সাত ডিগ্রির কিছু বেশি' কোণ উৎপন্ন করতে যদি ৮০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়, তাহলে ৩৬০ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করতে

কতোটা দূরত্ব অতিক্রম করা দরকার ? এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই পাওয়া যাবে পৃথিবীর পরিধি।

জ্যামিতি-শাস্ত্রের সাহায্যে ইরাটোস্থিনিজ প্রমাণ করেছিলেন তাঁর অঙ্কের প্রতিটি ধাপ। কিন্তু সরল ঐকিক নিয়মের সাহায্যেও উত্তরটা বের করা যেতে পারে। 'সাত ডিগ্রির কিছু বেশি' যে কোণ তা মোটামুটি ৩৬০ ডিগ্রির ৫০ ভাগের এক ভাগ। অতএব, পৃথিবীর পরিধি সিয়েন ও আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্বের ৫০ গুণ। অর্থাৎ, ৪০,০০০ কিলোমিটার। শেষ আধুনিক পরিমাপ অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি ৩৯,৮৪৪ কিলোমিটার। এ-থেকেই বোঝা যায়, দু হাজার বছর আগেও কতোখানি নির্ভুল ছিলেন ইরাটোস্থিনিজ।

সিয়েন ও আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব ইরাটোস্থিনিজ মাপেননি। তবে আলেকজাণ্ডার ও সমসাময়িক অন্যান্য সেনাপতিরা নিজেদের যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রয়োজনে বিভিন্ন শহরের দূরত্ব মাপতেন পেশাদার মাপিয়ে নিয়োগ করে। মাপিয়েরা লম্বা লম্বা পা ফেলে দূরত্ব মাপতো। দু-ধাপে যে দূরত্ব তারা অতিক্রম করতো, তাকেই মোটামুটিভাবে বলা হতো এক 'স্টাডিয়া'। দেশ বিশেষে 'স্টাডিয়া'র মাপের বেশ হেরফের হতো। অনুমান করা যায়, লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত থাকাকালীন বিভিন্ন দূরত্ব লিপিবদ্ধ করা কোনও নথিপত্র ইরাটোস্থিনিজ-এর হাতে এসেছিলো। তা থেকেই তিনি হয়তো পেয়েছিলেন সিয়েন ও আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব।

যে-কোনও বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত ধ্রুবক, এবং এই অনুপাতের মান মোটামুটিভাবে ৩·১৪। অতএব পৃথিবীর পরিধিকে এই অনুপাত দিয়ে ভাগ করে পৃথিবীর ব্যাসও নির্ণয় করে ফেলেছিলেন ইরাটোস্থিনিজ : ৮,০০০ মাইল অথবা ১২,৮০০ কিলোমিটার।

ইরাটোস্থিনিজ-এর হিসেব করা পৃথিবীর মাপ তৎকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতে চাননি। কারণ, বিশ্বাস করলে সেই সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হয় যে পৃথিবীর যেটুকু অংশ মানুষ আবিষ্কার করেছে তার তিনগুণ কি তারও বেশি অংশ অজানা থেকে গেছে।

সেই অজানা অংশে আছে হয় অনাবিষ্কৃত দেশ, নয় তো মহাসাগর। এ দুটোর কোনওটাই মেনে নেওয়া খুব কঠিন ছিলো সেকালের মানুষদের কাছে। কারণ মেনে নেওয়ার অর্থ নিজেদের আবিষ্কারের অক্ষমতা স্বীকার করা। ফলে চতুর্থ প্রচেষ্টায় পৃথিবীর পরিধি মেপে-ছিলেন যে গ্রীক দার্শনিক, তার দেওয়া মাপ ইরাটোস্থিনিজ-এর চেয়ে ছোট হওয়ায় সেটাই প্রাচীন ব্যক্তিদের বেশি পছন্দ হয়েছিলো।

আশি বছর বয়েসে রুগ্ন, শীর্ণ ও অন্ধ অবস্থায় স্বেচ্ছায় অনশন করে প্রাণত্যাগ করেন ইরাটোস্থিনিজ। ইরাটোস্থিনিজ-এর মৃত্যুর ছিয়ানব্বুই বছর পরে গ্রীক দার্শনিক পসিডনিয়াস পৃথিবীর পরিধি মাপার চতুর্থ প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। পসিডনিয়াসের পদ্ধতি ছিলো ইরাটোস্থিনিজ-এর পদ্ধতিরই অনুকরণ মাত্র। তিনি রোডস্ এবং আলেকজান্দ্রিয়া, এই শহর দুটিকে বেছে নিয়েছিলেন। আর সূর্যের বদলে ব্যবহার করেছিলেন 'ক্যানোপাস' তারাটিকে। রাতের আকাশে উজ্জ্বলতায় ক্যানোপাসের স্থান দ্বিতীয়, এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব, ক্যানোপাসের দূরত্ব তার ২,০৬,০০০ গুণেরও বেশি। ইরাটোস্থিনিজ-এর চেয়েও নির্ভুল উত্তর পেতে দূরের তারা ক্যানো-পাসকে বেছে নিয়েছিলেন পসিডনিয়াস। তাঁর নির্বাচিত 'দুটি শহরের' মধ্যেও দূরত্ব ছিলো ৮০০ কিলোমিটার। পসিডনিয়াস দেখেছিলেন, রোডস্ থেকে ক্যানোপাসকে যখন দিগন্তে দেখা যায়, তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় তারাটির কৌণিক উচ্চতা সাড়ে সাত ডিগ্রি। এরপর একই পদ্ধতিতে হিসেব নিকেশ করে তিনি পৃথিবীর পরিধির যে মান নির্ণয় করেন তা হলো ২৪,০০০ মাইল বা ৩৮,৪০০ কিলো-মিটার। পসিডনিয়াসের উত্তরে ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ দুটি: এক, সে-যুগে উপযুক্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ছিলো না। দুই, আবহাওয়াজনিত প্রতিসরণে তারার আপাত অবস্থান আর প্রকৃত অবস্থানে সামান্য তফাৎ থেকে যায়। ক্যানোপাসের অবস্থান নির্ণয়ের সময়ে আবহাওয়াজনিত প্রতিসরণ পসিডনিয়াস হিসেবের

মধ্যে ধরেননি।

প্রাচীন গ্রীসে পৃথিবী মাপার শেষ যে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়েছিলো, তার হোতা ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি। তাঁর প্রচেষ্টার কোনও বিশদ হদিশ পাওয়া যায়নি। ফলে অনুমান করা হয়, পসিডনিয়াসের পরীক্ষার ওপরেই মূলত নির্ভর করেছিলেন তিনি। টলেমি ধরে নিয়েছিলেন, এক ডিগ্রী কৌণিক দূরত্ব পৃথিবী-পৃষ্ঠের ৮০ কিলোমিটারের সমান। তারপর পসিডনিয়াসের অঙ্কে এই মান বসিয়ে পৃথিবীর পরিধির যে মাপ তিনি বের করেন তা হলো, ২৮,৮০০ কিলোমিটার। সন্দেহ নেই, এটা প্রকৃত মাপের অনেক কম। টলেমির মাপে এই গরমিলের কারণ, এক ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব পৃথিবী-পৃষ্ঠের প্রায় ১১০ কিলোমিটারের সমান।

গ্রীক বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত বিভিন্ন প্রচেষ্টার প্রায় ৭০০ বছর পরে আরবরা পৃথিবীর পরিধি মাপার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। অল-মামুন-এর আদেশে বাগদাদের কয়েকজন অঙ্কবিদ মেসোপটেমিয়ার সিন্‌জর-এর সমতলভূমিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তাঁদের নেওয়া মাপের কিছু গরমিল দেখে বোঝা যায়, যন্ত্রবিদ হিসেবে আরবরা সে-সময়ে ভীষণ দক্ষ ছিলেন বটে কিন্তু এই পরীক্ষায় যে ধরনের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রয়োজন ছিলো তা তখনও তাঁরা তৈরি করতে পারেনি।

এরপর মানুষ আবিষ্কার করলো টেলিস্কোপ। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাপজোখের অনেক সুবিধে হয়ে গেলো। আধুনিক যুগে, ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে, পৃথিবী মাপার উল্লেখযোগ্য প্রথম প্রচেষ্টা ছিলো ফ্রান্সের জা ফার্নেল-এর। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হেনরীর চিকিৎসক। ইরাটোস্থিনিজ-এর আবিষ্কৃত পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন জা ফার্নেল। তিনি বেছে নিয়েছিলেন প্যারিস ও আমিয়েন্স শহর দুটিকে, আর সূর্য ছিলো মাপজোখের তুলনা করার নির্দিষ্ট বিন্দু। এই পদ্ধতিতে প্রায় নির্ভুল উত্তর পেয়েছিলেন ফার্নেল।

এর পরে, আঠারো শতকের শেষ ভাগে, বিজ্ঞানী লাকেইল্ ও

কলেজের উপরোক্ত চার ছাত্রের ওপরে। ওরা আলোচনার শেষে ঠিক করলো, সোমবার রাতেই নিশ্চিতভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে ভূতের অস্তিত্ব। আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে নেওয়া হবে পিস্তল। এবং সহযোগী হিসেবে কয়েকজন ছাত্রকেও উপস্থিত থাকতে বলা হবে।

অবশেষে এসে গেলো সেই রাত। ভুতুড়ে বাড়ির দরজায় সেন্ট জন্‌স্ কলেজের ছাত্রদের রীতিমতো ভিড়। হঠাৎই, নিছক ঘটনাচক্রে, সেখানে এসে হাজির হলেন ট্রিনিটি কলেজের 'ফেলো' সেই বিশ্ববন্দিত মহাবিজ্ঞানী। ছাত্ররা একই সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো এবং লজ্জায় পড়ে গেলো। কিন্তু উনি ততক্ষণে ওদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। ইতিমধ্যে অভিযানের অন্যতম হোতা, পিস্তলধারী এক ছাত্রও দরজায় এসে হাজির। বিজ্ঞানী গম্ভীর স্বরে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার! এতো রাতে কলেজ হস্টেল ছেড়ে এখানে কি করছো তোমরা?'

উত্তরে কাচুমাচু হয়ে একজন ছাত্র জবাব দিলো, 'ভুতের খোঁজে এসেছি, স্যার। শুনেছি এ বাড়িটায় নাকি ভূত আছে...'

সেকথা শুনে একেবারে ফেটে পড়লেন প্রজ্ঞা-পুরুষটি, 'ছিঃ ছিঃ! নির্বোধের দল! কবে তোমাদের বোধবুদ্ধি হবে? তোমরা কি জানো না এসব ভূত-টুত সব ঠগ-জালিয়াতদের কারসাজি? ছিঃ, ছিঃ! যাও, এক্ষুণি বাড়ি চলে যাও!' অকুস্থল ছেড়ে পালাতে ছাত্ররা আর বোধহয় এক সেকেণ্ডও দেরি করেনি।

তৃতীয় ঘটনার সময়কাল ১৭২৪ সাল। তখন ঐ বিশিষ্ট বিজ্ঞান-সাধক টাঁকশালের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর কার্যকলাপ ও মুদ্রা তৈরির পদ্ধতিতে দেশের জালিয়াতেরা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ভাবছে, এ কেমন লোক রে বাবা! এমন সব কায়দায় মুদ্রা তৈরি করছে যে নকলই করা মুস্কিল! এমন সময় জনৈক জালিয়াত-চূড়ামণি ধরা পড়লো পুলিসের হাতে। ডাবির আদালতে তার বিচার হলো। বিচারে প্রাণদণ্ড পেলো সে। এ বিষয়ে মহামান্য বিজ্ঞানীর মতামত চাইলেন অনেকে। তখন তিনি ২৫শে আগস্ট

একটি চিঠি লিখে তৎকালীন মন্ত্রী লর্ড টাউনশেণ্ডকে জানালেন :

জালিয়াতির অপরাধে অভিযুক্ত এডমণ্ড মেট্‌কাফ্‌কে আমি চিনি না। কিন্তু মহামান্য আদালতের বিচারে সে যখন রাজশাস্তি পেয়েছে তখন আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে শুধু একটি কথাই বলবো, এ জাতীয় জালিয়াতেরা কখনও ক্ষান্ত হয় না। নিজেরা মুদ্রা জাল তো করেই, উপরন্ত অন্যদেরও এই অসৎ বিদ্যা শেখায়। তাছাড়া এইসব জালিয়াতদের ধরাও খুব শক্ত। সুতরাং রাজশাস্তি এদের পক্ষে অনুপযুক্ত নয়...'

উপরোক্ত তিনটি ঘটনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় এই মহা-বিজ্ঞানী মিতবাক ছিলেন, যুক্তি ও বিজ্ঞান-নির্ভর তথ্য ছাড়া অন্য কোনও অলৌকিক বা অতিলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করতেন না, এবং নীতিপরায়ণ কঠোর চরিত্র ছিলো তাঁর। জীবনের শেষভাগে তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য কিছুটা কমে এসেছিলো হয়তো, কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ। দুটো ছোট ঘটনার উল্লেখে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে।

প্রথমটির ঘটনাকাল ১৬৯৬ সাল। সুইজারল্যাণ্ডের জনৈক অঙ্কবিদ দুটো অঙ্ক নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানালেন সারা ইওরোপের বিজ্ঞানীদের। অঙ্ক দুটো দেখার পর মাত্র একদিনেই তার উত্তর কষে ফেললেন বিজ্ঞানী-সম্রাট। কিন্তু খ্যাতির মোহ তখন তাঁর ছিলো না। ততোদিনে বিশ্বজোড়া সুনাম খ্যাতি সম্মান তিনি বহু পেয়েছেন। সুতরাং আত্মপরিচয় গোপন রেখে উত্তর দুটো তিনি পাঠিয়ে দিলেন সুইজারল্যাণ্ডের সেই বিজ্ঞানীর কাছে। কিন্তু ধরা তাঁকে পড়তেই হলো। কারণ উত্তর পাওয়া মাত্র সুইস বিজ্ঞানী চিনে ফেললেন উত্তরদাতাকে। সর্বসমক্ষে বললেন, 'সিংহের থাবা আমি দেখামাত্রই চিনতে পেরেছি।'

দ্বিতীয় ঘটনা প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ও অঙ্কবিদ লাইপ্‌-নিৎসকে জড়িয়ে। তাঁর সঙ্গে ক্যালকুলাস গণিতের আবিষ্কার নিয়ে সামান্য মনকষাকষি ছিলো মহানায়কের। সেই রেষারেষির পরি-

প্রেক্ষিতে, শুধুমাত্র তাঁকে পরাজিত ও বিব্রত করার উদ্দেশ্যে, লাইপ্-নিৎস একবার একটা অঙ্ক কষতে দিলেন তাঁকে। তখন মহাবিজ্ঞানীর বয়েস চুয়াত্তর বছর। কিন্তু প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলেন লাইপ্‌নিৎস নিজেই। কারণ সেই অঙ্কের সমাধান কষে বের করতে মহানায়কের সময় লেগেছিলো মাত্র একটি বিকেল।

এতোক্ষণে আমরা হয়তো এই কিংবদন্তী পুরুষকে চিনে ফেলেছি। যদি না চিনে থাকি, তাহলে তাঁর প্রিয় কুকুর ডায়ামণ্ডের কাহিনী, অথবা গাছের আপেল খসে পড়া দেখে মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের আবিষ্কারের ঘটনা উল্লেখ করলেই চিনতে আর কোনও অসুবিধে হবে না যে আমাদের আলোচিত বিজ্ঞানী স্বয়ং স্যার আইজ্যাক নিউটন।

কথিত আছে, নিউটনের ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর প্রিয় কুকুর ডায়ামণ্ড নাকি তাঁর বহু বছরের গবেষণার অমূল্য কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলো জ্বলন্ত মোমবাতি উল্টে ফেলে দিয়ে। কিন্তু এই স্থিতধী বিজ্ঞানী অবোলা-অবোধ প্রাণীটিকে ক্ষমা করেছিলেন এই ঐতিহাসিক কথাগুলো বলে : 'ওরে ডায়ামণ্ড! তুই জানিস না, কি অসামান্য ক্ষতি তুই আজ করেছিস।'

আর আপেলের ঘটনা তো সবার জানা!

মাত্র তিরিশ বছর বয়েসে নিউটনের মাথার চুল পেকে যায়, কিন্তু আশি বছর বয়েস পর্যন্ত তাঁর শরীর যথেষ্ট সমর্থ ছিলো। ১৭২৭ সালে, মৃত্যুর পর, তাঁকে সমাধি দেওয়া হয় ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে—ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য নায়কোচিত প্রতিভাদের সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুর সময়ে প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক ভলতেয়ার ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। নিউটনকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি বলে-ছিলেন, 'অন্যান্য দেশ তাদের রাজাকে যে সম্মান দিয়ে থাকে, ইংল্যাণ্ড এই বিজ্ঞানীকে সেই সম্মান দিয়েছে।'

স্যার আইজ্যাকের সমাধি-ফলকে লাতিন ভাষায় লেখা রয়েছে, 'হে মানুষ! মানবজাতির এই মহান অলঙ্কার লাভের আনন্দে এসো, উৎসব করো।'

—

স্যার আইজাক নিউটন ছিলেন ক্রিসমাস-শিশু। কারণ জুলিয়ান-ক্যালেণ্ডার মতে ১৬৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন ইংল্যাণ্ডের উল্স্থর্প-এ। ছোটবেলা থেকেই রুগ্ন প্রকৃতির ছিলেন তিনি, এবং স্কুল-জীবনে তেমন কোনও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। তবে মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি আবিষ্কার করলেন বাইনোমিয়াল উপপাদ্য এবং নতুন গণিত—ক্যালকুলাস অথবা ফ্লাক্সন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করলেন। তার কিছুদিন পরেই ঘটলো সেই কিংবদন্তীসুলভ আপেল পড়ার ঘটনা।

ঘটনাটা অনেক গল্প ভাবলেও আসলে কিন্তু পুরোপুরি সত্যি। কারণ স্বয়ং নিউটনের কথাতেই এই কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে বন্ধুদের এই ঘটনার কথা বলেছিলেন তিনি। ১৬৬৬ সালে লণ্ডনে প্লেগের ভয়ঙ্কর মহামারী দেখা দেয়। বিপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে উল্স্থর্প-এ মায়ের বাগানবাড়িতে চলে এলেন



রুগ্ন স্যার আইজ্যাক। সেই সময়ে তিনি চাঁদের গতি নিয়ে ভীষণ ভাবছেন। ভাবছেন, কোন্ অদৃশ্য শক্তির টানে চাঁদটা পৃথিবীকে ঘিরে পাক খেয়ে চলেছে একান্ত অনুগত 'পুরাতন ভৃত্যের' মতো।

তখনই ঘটলো সেই অতিসাধারণ—অথচ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অসাধারণ—ঘটনা।

একদিন বিকেলে বাগানে চুপচাপ বসে আছেন স্যার আইজ্যাক। চাঁদের ভাবনায় ভাবনায় চন্দ্রাহত। হঠাৎই একটা গাছ থেকে টুপ করে খসে পড়লো একটি টুকটুকে আপেল। তক্ষুণি নিউটনের মাথায় খেলে গেলো, চাঁদকে যে বল পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, সেই একই বল আপেলটা পড়ার জন্য দায়ী নয় তো!

তখনকার দিনে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো, পার্থিব বস্তুদের জন্য যে গতিসূত্র প্রযোজ্য, সেগুলো আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়। নিউটন সেই প্রতিষ্ঠিত ভাবনাকে সরিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন নতুন ভাবনা। চাঁদ ও আপেলকে গেঁথে ফেললেন একই সূত্রে। বললেন, একই গতিসূত্র সবক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য এবং এইভাবেই আবিষ্কৃত হলো মাধ্যাকর্ষণ ও তার সূত্র। শুরু হলো তাঁর দুরন্ত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি।

এই নজিরবিহীন অলৌকিক অগ্রগতির ফসল নিউটনের অসামান্য বই 'প্রিন্সিপিয়া'। 'প্রিন্সিপিয়া'কে আজও মনে করা হয় মানবমেধার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠতম বহিঃপ্রকাশ। বইটির আসল নাম 'ফিলসফিয়া ন্যাচুরালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা', যার ইংরিজী তর্জমা দাঁড়ায় 'ম্যাথামেটিক্যাল প্রিন্সিপিল্‌স্ অফ ন্যাচারাল ফিলসফি'। কিন্তু শুধু 'প্রিন্সিপিয়া' নামেই বইটি চিরন্তন ইতিহাস হয়ে আছে। হয়ে আছে উজ্জ্বল ও অনন্য।

একটি অদ্ভুত ঘটনার দ্বারা বাধ্য না হলে নিউটন কবে যে 'প্রিন্সিপিয়া' লেখায় হাত দিতেন তা বলা শক্ত।

১৬৮৪ সালে বিখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিদ রবার্ট হুক এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন স্যার ক্রিস্টোফার রেন ও এডমণ্ড হ্যালির সঙ্গে। ওঁরা তিনজনেই ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য। পরবর্তীকালে রবার্ট হুক অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সোসাইটির সম্পাদকের পদে, এবং বিশিষ্ট ইংরেজ স্থপতি স্যার রেন পেয়েছিলেন সোসাইটির

সভাপতির আসন। আর তিনজনের মধ্যে কনিষ্ঠতম এডমণ্ড হ্যালি আজও অমর হয়ে আছেন একটি ধূমকেতুর নামের মাধ্যমে। 'হ্যালির ধূমকেতু' নামে যে-ধূমকেতুটিকে আমরা চিনি সেটির গতিতত্ত্ব তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

ইতিমধ্যে মাধ্যাকর্ষণ ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়ে অহঙ্কারী রবার্ট হুক কিছু কিছু গবেষণা করেছিলেন। এবং নিউটনের সঙ্গে, যে কোনও কারণেই হোক, তাঁর সম্পর্ক বিশেষ ভালো ছিলো না। সম্ভবত নিউটনকে তিনি সামান্য ঈর্ষাও করতেন। তিনি জানতেন, এডমণ্ড হ্যালি স্যার আইজ্যাকের বিশেষ প্রিয়জন, এবং মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে স্যার রেন নিজেও অল্পবিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। তাই কথা-প্রসঙ্গে গ্রহদের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তিনি যে কি মূল্যবান গবেষণা করে সফল হয়েছেন তা অত্যন্ত দাম্ভিক সুরে জানালেন স্যার রেনকে। সেই সঙ্গে গ্রহদের গতির কারণ হিসাবে একটা ব্যাখ্যাও দিলেন। স্যার রেন কিন্তু এই ব্যাখ্যায় মোটেও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন, দুজনের মধ্যে যে গ্রহ-গতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারবে তাকে তিনি চল্লিশ শিলিং দামের একটি বই উপহার দেবেন। আর হ্যালি দুঃখ ও ক্ষোভ নিয়ে ফিরে এলেন অগ্রজপ্রতিম নিউটনের কাছে।

হুকের কাছে শোনা সমস্যার উল্লেখ করে হ্যালি বললেন, 'আচ্ছা, যদি এমন কোনও বল গ্রহগুলোর ওপরে ক্রিয়া করে যেটা দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে ধীরে ধীরে কমে আসে, তাহলে গ্রহগুলো সূর্যকে ঘিরে কি ধরনের পথে পাক খাবে বলতে পারেন ?'

আইজ্যাক নিউটন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এ তো খুব সহজ ! উপবৃত্তাকার পথে পাক খাবে !'

উত্তর শুনে হ্যালি তো বিস্ময়ে হতবাক। মনমরাভাব মুহূর্তে কেটে গেলো তাঁর। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি জানলেন কি করে ?'

'স্রেফ অঙ্ক কষে দেখেছি।' নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিলেন

নিউটন। তারপর হ্যালিকে বললেন ১৬৬৬ সালের আপেল পড়ার ঘটনার কথা, এবং তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে কি গবেষণা তিনি করেছেন। সব শুনে হ্যালি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় সেই গবেষণার কাগজপত্র ?'

ঘরে ছড়ানো ধুলোময় কাগজের স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে নিউটন বললেন, 'আছে ওখানে কোথাও।'

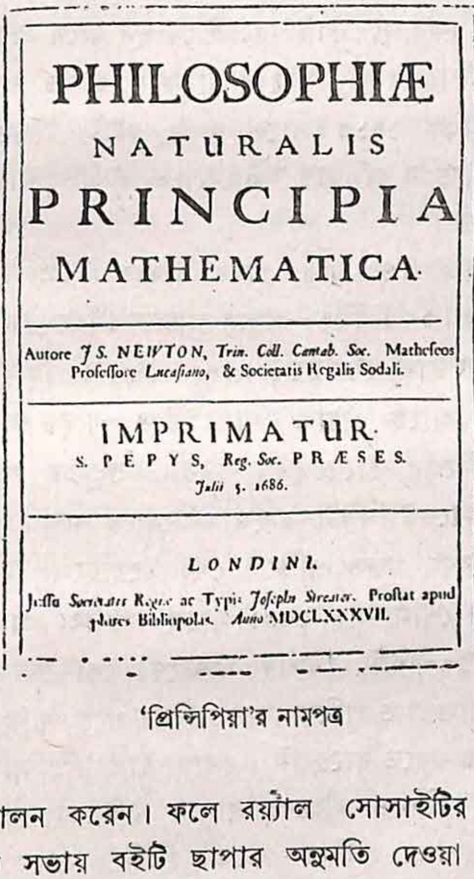
হ্যালি তখন বার বার করে তাঁকে অনুরোধ করলেন সেই অসমাপ্ত গবেষণা শেষ করতে। হ্যালির আগ্রহ ও উৎসাহে আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন নিউটন।

অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র আঠারো মাসে শেষ হলো 'প্রিন্সিপিয়া' লেখার কাজ। সেই সময়টা কি গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিউটন কাজ করেছেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর সহকারী ও সচিব মিঃ হামফ্রি নিউটনের কথায়ঃ···'রাত দুটো-তিনটের আগে তিনি ঘুমোতে যেতেন না। আর যখন রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, তখন তো ভোর পাঁচটা-ছ'টা বেজে যেতো। দৈনিক বিশ্রাম নিতেন মাত্র চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা, আর সবসময় ঘরের মধ্যে অস্থির-ভাবে পায়চারি করতেন। খাবার-দাবার ছুঁয়েও দেখতেন না প্রায়ই। কদাচিৎ কখনও যখন কলেজ-হলে খেতে যেতেন, তখন তাঁর চেহারা থাকতো ঝোড়ো কাকের মতো—চুল উস্কোখুস্কো, জুতো আধখোলা···।'

'প্রিন্সিপিয়া' লেখা হলো তিনটি খণ্ডে। প্রথম খণ্ডটি ১৬৮৬ সালের ২৮শে এপ্রিল তিনি হাজির করলেন লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সামনে। ক্লেয়ার হলের 'ফেলো' ডঃ ভিনসেণ্ট বইটি পেশ করলেন সোসাইটির সদস্যদের এক সভায়। বললেন, 'এই বইতে কোপার্নিকাসের মতবাদ ও কেপ্‌লারের সূত্রকে গণিতিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমাদের একজন সদস্য, মিঃ নিউটন, এবং এই বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন সোসাইটির নামে।'

লেখককে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দেবার প্রস্তাব গৃহীত হলো

সভায়, এবং বইটি ছাপার কথা কাউন্সিল বিবেচনা করে দেখবেন, এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। পাণ্ডুলিপিটি অতঃপর তুলে দেওয়া হলো এডমণ্ড হ্যালির হাতে। অনুরোধ করা হলো, তিনি যেন পাণ্ডুলিপিটি পড়ে কাউন্সিলকে লিখিত মতামত জানান। হ্যালি সেই দায়িত্ব


PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.

Autore *J S. NEWTON*, *Trin. Coll. Cantab. Soc.* Matheseos Professore *Lucasiano*, & Societatis Regalis Sodali.

IMPRIMATUR.
S. PEPYS, *Reg. Soc.* PRÆSES.
Julii 5. 1686.

LONDINI,
Jussu Societatis Regiæ ac Typis *Josephi Streater*. Prostat apud plures Bibliopolas. *Anno* MDCLXXXVII.

'প্রিন্সিপিয়া'র নামপত্র

সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। ফলে রয়্যাল সোসাইটির কাউন্সিলের পরবর্তী এক সভায় বইটি ছাপার অনুমতি দেওয়া হলো ; কিন্তু সোসাইটির হাতে উপযুক্ত অর্থ না থাকায় তাঁরা হ্যালিকে অনুরোধ করলেন বইটি প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবার জন্য।

১৬৮৪ সালে কোনওএক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে হ্যালির পিতা নিহত হন। ফলে তাঁর রেখে যাওয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন এডমণ্ড হ্যালি। সুতরাং সোসাইটির অনুরোধ রাখায়

আর্থিক কোনও অসুবিধেই ছিলো না তাঁর।

১৬৮৭-র ৬ই এপ্রিল 'প্রিন্সিপিয়া'র তৃতীয় খণ্ড রয়্যাল সোসাইটির কাছে উপস্থিত করলেন নিউটন। বই ছাপার কাজ তখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। হ্যালি বইয়ের সমস্ত কাঠ-খোদাই ছবির জোগাড় করলেন, গ্যালি প্রুফ দেখলেন নিজে, এক কথায় অমানুষিক পরিশ্রম করে সেই বছরেই মে-জুন মাসে প্রকাশ করলেন কিংবদন্তী সৃষ্টিকারী বইটি। বইয়ের ভূমিকায় কোনও তারিখ দেওয়া ছিলো না। কিন্তু ১৭১৩ সালে যখন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন ভূমিকায় '৮ই মে, ১৬৮৬' এই তারিখটির প্রথম উল্লেখ করা হয়।

যতদূর খোঁজ পাওয়া যায়, প্রথম সংস্করণে 'প্রিন্সিপিয়া'র দাম রাখা হয়েছিলো ১০ শিলিং—অর্থাৎ আজকের হিসেবে আনুমানিক দশ টাকা, এবং ছাপা হয়েছিলো ২৫০০ কপি। বইটির মূল পাণ্ডুলিপি এখনও রাখা আছে রয়্যাল সোসাইটিতে—যদিও সেই পাণ্ডুলিপি নিউটনের নিজের হাতে লেখা নয়। শুধুমাত্র পরিমার্জন ও সংশোধনের কাজেই নিউটনের হস্তাক্ষর চোখে পড়ে।

অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত গতিতে শেষ হয়েছিলো 'প্রিন্সিপিয়া'র প্রথম সংস্করণ। শোনা যায়, ১৬৯১ সালে—অর্থাৎ, প্রকাশের মাত্র চার বছর পর—বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতায় জড়িয়ে পড়ে স্যার আইজ্যাক সে কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। শোনা যায়, 'প্রিন্সিপিয়া' লেখার পরিশ্রমে ও ব্যক্তিগত জীবনের নানান জটিলতায় ১৬৯৩ সালে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। তার ওপর ১৬৯৬ সালের ১৯শে মার্চ তিনি টাঁকশালের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ফলে 'প্রিন্সিপিয়া'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সম্ভাবনা আরও ফিকে হয়ে আসে।

অবশেষে ১৭০৮ সালে গঠনমূলক তোড়জোড় শুরু হয়। ট্রিনিটি কলেজের পরিচালক রিচার্ড বেণ্টলি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের

দায়িত্ব নেন। 'প্রিন্সিপিয়া'র প্রথম সংস্করণের একটি কপি পরিমার্জন ও সংশোধন করে নিউটন তুলে দিয়েছিলেন বেণ্টলির হাতে। কিন্তু একটি বছর নিষ্ফলা কেটে যায়। তারপর, ১৭০৯ সালে রিচার্ড বেণ্টলি মনের মতো একজন সম্পাদক খুঁজে পেলেন। তিনি ট্রিনিটি কলেজের 'ফেলো' ও 'প্লুমিয়ান প্রফেসর' জ্যোতির্বিজ্ঞানী রজার কোট্স্। কোট্স্ বিনা পারিশ্রমিকে এই গুরুত্বপূর্ণ ভার নিলেন এবং নিউটনের সংশোধিত 'প্রিন্সিপিয়া'র কপিটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কোট্স্ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাজ শুরু করলেন। বয়েসে স্যার আইজ্যাকের চেয়ে চল্লিশ বছরের ছোট হলেও গণিতজ্ঞ হিসেবে কোট্স্-এর ঈর্ষণীয় খ্যাতি ছিলো। 'প্রিন্সিপিয়া'র বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন ইত্যাদির বিষয়ে তিনি প্রায়ই চিঠিপত্রে যোগাযোগ করে চললেন নিউটনের সঙ্গে। বই ছাপার কাজ শুরু হলো। কোট্স্ নিজে প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রুফ দেখে তারপর ছাপতে দিতেন এবং একই সঙ্গে অণুবীক্ষণ নজরে বিভিন্ন গাণিতিক তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করে নিতেন। কিন্তু এতো সতর্কতা সত্ত্বেও প্রথম সংস্করণের কয়েকটি ভুল অসংশোধিত হয়েই ছাপা হয়ে গিয়েছিলো দ্বিতীয় সংস্করণে। সেই প্রসঙ্গে ১৭১২ সালের ১৪ই অক্টোবর রজার কোট্স্‌কে একটি চিঠি লেখেন নিউটন। তাতে বললেন, 'ধূমকেতুতত্ত্বের শেষাংশ পাঠালাম।…বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের দশ নম্বর প্রতিজ্ঞার ভুলটুকু শুধরে পাঠাচ্ছি…হয়তো বারো পৃষ্ঠা আবার নতুন করে ছাপতে হতে পারে। নতুন করে ছাপার খরচটা আমিই দেবো…'

কার্যত কিন্তু বইটির ষোলো পৃষ্ঠা নতুন করে ছাপতে হয় এবং তার খরচটা বেণ্টলিই বহন করেছিলেন।

অবশেষে ১৭১৩ সালের ১২ই মে প্রকাশিত হলো 'প্রিন্সিপিয়া'র দ্বিতীয় সংস্করণ। বেণ্টলির হিসেব থেকে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় সংস্করণে 'প্রিন্সিপিয়া' ছাপা হয়েছিলো মোট ৭০০ কপি। মুদ্রাকর ছিলেন কর্নেলিয়াস ক্রাউনফিল্ড। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো ৫২৮। আর ছাপতে খরচ পড়েছিলো একশো পনেরো পাউণ্ড এগারো শিলিং

সাড়ে সাত পেন্স। অর্থাৎ, আমাদের হিসেবে মোটামুটিভাবে ২৩০০ টাকা। বইটির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিলো 'গেজেট', 'পোস্ট-বয়', 'ডেইলি ক্যুর‍্যাণ্ট' ও 'ইভনিং পোস্ট' পত্রিকায়—প্রতিটি কাগজে ছ-বার করে। বিজ্ঞাপন বাবদ বেণ্টলির মোট খরচ পড়েছিলো এক পাউণ্ড বারো শিলিং ছ' পেন্স—অর্থাৎ, প্রায় ৩০ টাকা।

সৌজন্য সংখ্যা হিসাবে স্যার আইজ্যাক পেয়েছিলেন ১০ কপি ও সম্পাদক রজার কোট্‌স্ পেয়েছিলেন ১২ কপি বই। প্রকাশক রিচার্ড বেণ্টলি লাভ করেছিলেন আনুমানিক ২০০ পাউণ্ড।

স্যার আইজ্যাকের জীবিতকালে, ১৭২৬ সালের ১২ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয় বইটির তৃতীয় সংস্করণ, এবং ১৭২৭ সালের ২০শে মার্চ নিউটন প্রয়াত হন।

'প্রিন্সিপিয়া' লেখা হয়েছিলো লাতিন ভাষায়—সপ্তদশ শতাব্দীতে গুণীসমাজে যে ভাষায় বিদ্যাচর্চার প্রচলন ছিলো। বইটির প্রথম ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭২৯ খ্রীস্টাব্দে, নিউটনের মৃত্যুর ছ'বছর পরে। আর বইটির ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১৭৩৫ সালে, এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিজ্ঞানী মহলেও অভাবনীয় সাড়া জাগায় বইটি। ফরাসী ভাষায় এই অনুবাদটি করেছিলেন প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক ভলতেয়ারের জনৈক উপপত্নী।

স্যার আইজ্যাক বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বই লিখলেও 'প্রিন্সিপিয়া' ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী : সেদিনও—আজও।

টাঁকশালে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেবার পর স্যার আইজ্যাক বিজ্ঞান-চর্চা থেকে অনেকটা সরে আসেন, এবং জীবনের শেষ পঁচিশ-তিরিশ বছর নিজের প্রতিভার মর্যাদা রাখতে পারে এমন কোনও গবেষণামূলক কাজ তিনি করেন নি। কিন্তু সবকিছু বিচার করেও বলা যায়, বিজ্ঞানের এই প্রবাদ পুরুষ তাঁর হিমালয়স্পর্শী ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা নিয়ে নিজের চওড়া কাঁধে তুলে নিয়েছেন বিজ্ঞানের পরবর্তী অন্বেষকদের, তাঁদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন

আন্তরিক ভাবে। সেই কারণেই তিনি অনন্য।

সবশেষে উল্লেখ করা যায় নিউটনকে নিয়ে লেখা আলেজাণ্ডার পোপ-এর বিখ্যাত চরণ দুটি ঃ

প্রকৃতি ও প্রকৃতির সূত্রসকল
আঁধারেতে প্রচ্ছন্ন ছিলো।
ঈশ্বর কহিলেন, হউক নিউটন !
আঁধার আলোকে উদ্ভাসিলো ॥

সূর্য কতো দিন বাঁচবে?

এ প্রশ্ন আমাদের মনে জেগে ওঠাটা স্বাভাবিক কারণ সূর্য আমাদের বিভিন্ন শক্তির প্রধান উৎস। তাছাড়া, সূর্য নিভে গেলে পৃথিবীবাসী এই মানুষ একই সঙ্গে তাল মিলিয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের বেঁচে থাকাটা আমাদের পক্ষে এতোই জরুরী যে ইচ্ছে না থাকলেও তার পরমায়ু নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে।

প্রথমেই জানিয়ে দিই, আকাশের ঐ জ্বলন্ত সূর্যটা কিন্তু মোটামুটি ৫০০ কোটি বছরের পুরোনো। আর এই ৫০০ কোটি বছর ধরেই বেচারা আমাদের শক্তি যুগিয়ে আসছে। পৃথিবীর সমস্ত শক্তিই একরকমভাবে তৈরি হয়েছে সূর্য থেকে—অবশ্য এটা জানতে হলে খুব খুঁটিয়ে ধাপে ধাপে বিচার করতে হবে। যেমন ধরা যাক, কয়লা কিংবা কাঠ আমাদের প্রধান জ্বালানী, এবং এই জ্বালানীর আগুন থেকেই মানব-সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু সূর্য না থাকলে আমরা কয়লাও পেতাম না, কাঠও পেতাম না। কারণ কয়লা ও কাঠের উৎস গাছ। আর সূর্যের আলো ও তাপ ছাড়া কোনও গাছ যে বড় হতে পারে না, বাঁচতে পারে না, সে তো আমরা সবাই জানি। অতএব মূল উৎস সেই প্রভাকর সূর্য।

সূর্য কি দিয়ে তৈরি সেটা এবার জেনে নিলে তার আয়ু হিসেব করতে আমাদের সুবিধে হতে পারে। সূর্যে যা কিছু আছে তা হলো গ্যাস। শতকরা ৯০ ভাগ হাইড্রোজেন গ্যাস, আর বাকিটুকু প্রধানতঃ হিলিয়াম নামে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এই গ্যাসগুলো কি দাউ-দাউ করে জ্বলছে? মোটামুটি ১৫ কোটি কিলোমিটার দূর থেকে, অর্থাৎ, এই পৃথিবী থেকে সূর্যকে দেখে সেই ধারণাই জন্ম নেয় আমাদের মনে। কিন্তু জেনে রাখা ভালো, সূর্যের পক্ষে 'দাউ-দাউ' করে জ্বলা সম্ভব নয়। এর কারণ হলো তার তাপমাত্রা। সূর্যের বাইরের তাপমাত্রা হলো প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর ভেতরের তাপমাত্রা কয়েক কোটি ডিগ্রি! এই সুবিশাল তাপমাত্রায়

কোনও মৌলিক কিংবা যৌগিক পদার্থের পক্ষে জ্বলা অসম্ভব। কেন, সেটাই এবারে দেখা যাক।

কোনও পদার্থের 'দহন'-এর অর্থ সে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অন্য কোনও যৌগে পরিণত হবে। এর জন্য তাপের প্রয়োজন হয়। ধরা যাক, আমরা দেশলাইয়ের কাঠি ঘষে জ্বাললাম। 'দহন' হলো। অর্থাৎ, দেশলাইয়ের লোহিত ফসফরাস বিক্রিয়া করলো বায়ুর উপাদানের সঙ্গে। আবার দেশলাইয়ের আগুনে কাঠ পোড়ালেও কাঠের বিভিন্ন উপাদানের বিক্রিয়া হয় বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে। এ-সব বিক্রিয়াই কিন্তু ঘটে কম তাপমাত্রায়—১০০/২০০ কি ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। কিন্তু তাপমাত্রা যদি ক্রমে ক্রমে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বিক্রিয়ায় তৈরি যৌগিক পদার্থগুলো আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সমস্ত মৌলিক উপাদানে। যেমন, জলকে উত্তপ্ত করলে প্রথমে বাষ্প তৈরি হয়, তারপর আরও উত্তাপ দিতে থাকলে এক সময়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস আলাদা হয়ে যায়। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ক্ষেত্রেও অতি-উত্তাপ কার্বন এবং অক্সিজেন-এর জন্ম দেয়। সুতরাং ৬০০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সমস্ত পদার্থ ই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে নিজের মৌল উপাদানে, এবং এই রকম বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ দিয়েই আমাদের সূর্যটা তৈরি।

এই প্রচণ্ড তাপের ফলে সূর্যে সব সময়েই ঘটে চলেছে নিউক্লীয় বিক্রিয়া এবং এই কারণেই শতকরা ছ'ভাগ যে কঠিন পদার্থ সূর্যে রয়েছে, তার সবটুকুই আছে গ্যাসীয় অবস্থায়। তার ওপর, সূর্যের ভেতরে অবিশ্বাস্য চাপের কথাটাও ভুললে চলবে না। সূর্যের আভ্যন্তরীণ চাপ হলো, আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় ১,০০০ কোটি গুণ! সুতরাং এই প্রচণ্ড চাপ ও ২/৩ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিউক্লীয় বিক্রিয়ার ফলে প্রতি মুহূর্তে সূর্যের চারটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু মিলিত হয়ে তৈরি করছে একটি হিলিয়াম অণু। বিক্রিয়ার ফলে সামান্য একটু ভর কমে গিয়ে তৈরি

হয় শক্তি। এবং এই শক্তিই সূর্যকে 'জ্বলন্ত' অবস্থায় থাকতে সাহায্য করে।

একটা কথা বলে রাখা ভালো যে সূর্যের উপাদান, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস, ঐ ভয়ঙ্কর ভৌত পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ আয়নিত অবস্থায় থাকে। ইলেকট্রনগুলো হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত। এবং প্রকৃতপক্ষে চার-চারটে হাইড্রোজেন কেন্দ্রক মিলে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রক তৈরি করে। এই অবিরাম নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় বিস্ময়কর হারে সূর্যের ভর কমে যায় : প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ লক্ষ টন! অথচ আমাদের চোখে সূর্য বহু বছর ধরে সেই একই রকম আছে—কোনও হেরফের তার হয়নি।

আমাদের চোখে এই তফাৎটুকু যে ধরা পড়েনি তার কারণ প্রধানতঃ দুটো। এক, সূর্য আমাদের কাছ থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে এবং দ্বিতীয় কারণ, সূর্যের ভর ২×১০^{২৭} টন! প্রতি সেকেণ্ডে ক্ষয়ে যাওয়া ৪০ লক্ষ টনের চেয়ে যা অনেক বেশি। এছাড়া অন্যান্য কারণের একটা হলো, সূর্য জ্বলন্ত অবস্থায় থাকার ফলে তার সঠিক চেহারা বা পরিধি আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না।

দেখা যাচ্ছে, সব দিক থেকেই সূর্য পৃথিবীর চেয়ে বড়। তার অভিকর্ষ পৃথিবীর ৮০০ গুণ। তার আয়তন পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ। এই রকম আরো কতো বিষয়ে সে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে গেছে! তবে একটা ব্যাপারে সে কিন্তু ভীষণভাবে হেরে গেছে আমাদের পৃথিবীর কাছে। সেটা হলো, গড় ঘনত্ব।

পৃথিবীর গড় ঘনত্ব ৫·৫ গ্রাম/ঘন সে. মি। আর সূর্যের গড় ঘনত্ব ১·৪ গ্রাম/ঘন সে.মি—অর্থাৎ প্রায় ৪ ভাগের ১ ভাগ!

তবে কোনও গ্রহ-নক্ষত্রের ঘনত্ব তার অভ্যন্তরের সব জায়গায় সমান থাকে না। তেমনি সূর্যের ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। সূর্যের কেন্দ্রে ঘনত্ব হলো গড় ঘনত্বের প্রায় ৫০ গুণ! অর্থাৎ সেখানে বিভিন্ন গ্যাস খুব ঘন করে ঠাসা : পারদের ঘনত্বের প্রায় ৬

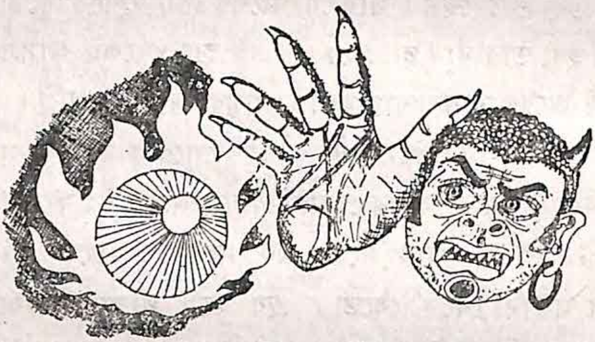
গুণ তাদের ঘনত্ব। অথচ সূর্যের বাইরের স্তরগুলো কিন্তু খুব পাতলা বা তনুভূত। তার সব চেয়ে বাইরে যে পরিমণ্ডলের স্তর রয়েছে তার নাম বর্ণমণ্ডল ; এর গভীরতা কয়েক হাজার মাইল, তাপমাত্রা মোটামুটি ২০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অথচ এর চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ! একমাত্র পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে বর্ণমণ্ডলের কিছু অংশ দেখা যায় ; তাকে বলা হয় কিরীটিকা। এই কিরীটিকা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বহু নতুন তথ্য পেয়েছেন। আর যে অংশের জন্য সূর্যকে এতো দীপ্তি-মান মনে হয়, তার নাম দ্যুতিমণ্ডল। এই স্তর থেকেই আসল সূর্যের শুরু। এই স্তরের তাপমাত্রার কথাই আমরা আগে বলেছি।

সূর্য সম্পর্কে এতো তথ্য মানুষ জানতে পেরেছে তার অনুসন্ধিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ও বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতির ফলে। নইলে ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরের এই নক্ষত্রটি হয়তো চিরকালই আমাদের অজানা থেকে যেতো। সূর্য হয়ে থাকতো সূর্যদেবতা। সত্যি বলতে কি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরের ফারাও চতুর্থ আমেনোফিস সূর্যদেব বা 'আতেন্'-এর পূজার প্রচলন করেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিলো, আমাদের পৃথিবীকে আলো দেয় একমাত্র সূর্য। এবং এই পুজোর ফতোয়া জারির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের নামটিও পালটে ফেলেন। নতুন নাম নেন, 'আখনাতন্', যার অর্থ হলো 'স্বাগত আতেন্'।

শরীরে কোথাও জ্বালা-যন্ত্রণা হলে কিংবা কোনও স্বাদ—টক-ঝাল মিষ্টি—আমাদের মস্তিষ্কে এসে পৌঁছয় লক্ষ লক্ষ স্নায়ুতন্ত্রী বেয়ে। তারপর মস্তিষ্ক আমাদের জানিয়ে দেয় দেহের কোথায় কি ঘটেছে। অর্থাৎ, জিভের স্বাদ বা ত্বকের স্পর্শ আমরা টের পাই মস্তিষ্কের মারফৎ। এ ভাবে খবর পেতে আমাদের কিছুটা সময় লাগে। এই খবর স্নায়ুতন্ত্রী বেয়ে ছুটে চলে সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ মিটার বেগে। তাই খুব তাড়াতাড়ি—বলতে গেলে, প্রায় তক্ষুনি—আমরা খবরটা পেয়ে যাই। কিন্তু সূর্য থেকে এভাবে খবর পেতে গেলে আমাদের

লাগতো প্রায় ১৬০ বছর !

এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,'···মনে করা যাক এমন একটা দৈত্য আছে, পৃথিবী থেকে হাত বাড়ালে যার হাত সূর্যে পৌঁছতে পারে। দুঃসাহসী দৈত্যের হাত যতই শক্ত হোক, সূর্যের গা ছোঁবামাত্রই যাবে পুড়ে। কিন্তু পুড়ে যাওয়ার যে ক্ষতি ও যন্ত্রণা নাড়ীযোগে সেটা টের পেতে তার লাগবে প্রায় একশো ষাট বছর। তার আগেই সে মারা যায় তো জানবেই না।···'



সত্যিই এতো দূরে সূর্যটা রয়েছে যে সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতেও সময় নেয় ৮ মিনিট।

আর একটা কথা ভাবলে হয়তো খুব অবাক লাগবে, এই সূর্যটা তার গ্রহমণ্ডলী নিয়ে এক ছায়াপথের চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে ভীষণ বেগে : সেকেণ্ডে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার। সেই ছায়াপথকে এক পাক ঘুরে আসতে সূর্যের সময় লাগে ২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর ! আর সূর্য নিজের মেরুদণ্ডের ওপর এক পাক ঘুরতে সময় নেয় ২৬ দিন। যেটা পৃথিবীর তুলনায় ২৬ গুণ বেশি। আর সব শেষে, একশো দশটা পৃথিবীকে পাশাপাশি রাখলে সূর্যের ব্যাস-এর আঁচ পাওয়া যেতে পারে।

সুতরাং নানা দিক থেকে বিশাল ও বিচিত্র এই জ্বলন্ত পিণ্ডটির সম্পর্কে বহু কথাই আলোচনা করা গেলো। আর পৃথিবীর মানুষের কাছে এই নক্ষত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা তো আগেই জানিয়েছি।

সুতরাং সূর্যের ভালোমন্দ নিয়ে আমাদের তো একশোবার ভাবতে হবে! তার ওপর যখন জানতে পারছি প্রতি সেকেণ্ডে তার শরীর থেকে ৪০,০০,০০০ টন ওজন কমে যাচ্ছে, তখন ভাবনা বেড়ে তৈরি হতে পারে দুশ্চিন্তা। সুতরাং, এবারে তার পরমায়ুর হিসেবটা করে ফেলা যাক।

সূর্যের ভর ২×১০^{২৭} টন। অতএব এই ভর পুরোপুরি ক্ষয়ে যেতে গেলে সময় লাগবে ৫×১০^{২০} সেকেণ্ড, অথবা, প্রায় ১৬ লক্ষ কোটি বছর! কিন্তু গবেষণায় এ-কথা জানা গেছে যে সূর্যকে আমরা যেমনটি দেখি ঠিক সেইভাবে সে তার তেজ ও কিরণ নিয়ে টিঁকে থাকবে কম করেও ৬০০কোটি বছর। অর্থাৎ, সে এখনও তার জীবনের অর্ধেকই পেরোয়নি।

পরিণতিতে সূর্যের অবস্থাটা কিরকম হবে সেটা বিজ্ঞানীরা কম-বেশি আঁচ করেছেন। সাধারণতঃ কোনও নক্ষত্র তার সাম্য বজায় রাখে দুটো বলের সমতায়। একটা তার আভ্যন্তরীণ বিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া চাপ, দ্বিতীয় বল তার নিজের মাধ্যাকর্ষণ বল। সূর্যের ক্ষেত্রেও এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। যেদিন সূর্যের নিউক্লীয় বিক্রিয়া শেষ হবে, সেদিন সমস্ত হাইড্রোজেন পরিণত হবে হিলিয়ামে। নক্ষত্রের ভেতরের চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু থেকে অতি চাপে মুক্ত ইলেকট্রন কণাগুলো। আর মাধ্যাকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ভর সৃষ্টি করে গ্যাস পরমাণুর কেন্দ্রকগুলো। আমরা জানি যে হাইড্রোজেনের তুলনায় হিলিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রনের সংখ্যা দ্বিগুণ এবং কেন্দ্রকের ভর চারগুণ। ফলে সূর্যে প্রায় সবটাই হাইড্রোজেন পরমাণু থাকা অবস্থায় ইলেকট্রনগুলোর চাপ কেন্দ্রকগুলোর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে সামাল দিয়ে ধরে রাখতে পেরে-ছিলো। তৈরি হয়েছিলো সাম্য-অবস্থা। কিন্তু সমস্ত পরমাণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হলে ইলেকট্রনের তুলনায় কেন্দ্রকের সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ। অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ চাপের তুলনায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেড়ে যাবে। ফলে সাম্য-অবস্থা টলে যাবে। তখন মাধ্যাকর্ষণের চাপে সূর্য

আয়তনে ছোট হতে শুরু করবে, আর তার ঘনত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকবে। আর এই অবস্থায় সূর্যের গড় ঘনত্ব হবে জলের ঘনত্বের ৩০ লক্ষ গুণ! সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঘনত্ব হবে এরও ১০ গুণ। অর্থাৎ এক ঘন সেন্টিমিটার সূর্য-বস্তুর ওজন হবে প্রায় ৩০ টন। এই তথ্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন আমেরিকানিবাসী নোবেলজয়ী ভারতীয় বিজ্ঞানী সুব্রম্যনিয়ান চন্দ্রশেখর।

মাধ্যাকর্ষণের এই চাপে সূর্যের ভেতরের তাপমাত্রা যাবে শতগুণ বেড়ে। ফলে সে আয়তনে ছোট হয়ে গেলেও তার উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে বহুগুণ। এই অবস্থাকেই বলা হবে 'সাদা-বামন' বা 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ'! তখন কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়তো সূর্যকে ভাববেন লক্ষ কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোনও উজ্জ্বল নক্ষত্র! চাঁদ এখন আমাদের যা আলো দেয়, সূর্য তখন আলো দেবে তার মাত্র ১০০০ গুণ! আর চাঁদ তখন এতোই আবছা হয়ে যাবে যে সে বেচারীকে আর খালি চোখে দেখাই যাবে না। পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে নেমে যাবে শূন্য ডিগ্রিরও নিচে প্রায় ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস! পৃথিবীর বুকে সমস্ত প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ক্রমে-ঠাণ্ডা-হয়ে-যাওয়া সূর্যের ওপরে পড়বে বরফের আস্তরণ। সে আকাশে থাকবে এক নিষ্প্রাণ পিণ্ড হয়ে, তবে আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য আটটা গ্রহ তখনও সূর্যের সঙ্গী হয়ে থাকবে, অনুগত হয়ে প্রদক্ষিণ করে চলবে তাকে।

তবে এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন থেকে যায়ঃ সত্যিই কি মানুষ দেখতে পাবে নিভে আসা সূর্যকে? সম্ভবত না। কারণ হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে বিক্রিয়ার ফলে যে হিলিয়াম পরমাণু জন্ম নিচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও নেবে, তারা খুব ভালো তাপ পরিবহণ করতে পারে না। অর্থাৎ বিক্রিয়ার ফলে ও মাধ্যাকর্ষণের চাপে সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যে তাপ উৎপন্ন হবে সেটা খুব সহজে হিলিয়াম পরমাণুর স্তর ভেদ করে সূর্যের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এখন কিন্তু সেই অসুবিধেটা নেই, কারণ হাইড্রোজেন তাপ পরিবহণে খুব তৎপর।

সুতরাং তখন কুপরিবাহী হিলিয়াম সূর্যের ভেতরের তাপকে বন্দী রেখে দেওয়ায় এমন একটা পরিস্থিতি আসতে পারে যখন সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপ ও চাপে এক বিশাল বিস্ফোরণ ঘটবে। আর সূর্যের তেজও যাবে বহু গুণ বেড়ে। এখন সূর্যের যা তেজ, তার চেয়ে মাত্র ১০০ গুণ বেশি হলেই আমাদের নদ-নদী-সমুদ্রের জল টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে। সুতরাং লক্ষ লক্ষ গুণ তেজ বেড়ে গেলে আমাদের পৃথিবী মুহূর্তে ভস্ম হয়ে মিলিয়ে যাবে মহাশূন্যে। সেই মহা-বিস্ফোরণের পর সূর্যের সঙ্কোচন শুরু হবে। কিন্তু তা দেখবার জন্য পৃথিবীতে কেউই হয়তো বেঁচে থাকবে না।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, একটি জিরাফকে নিয়ে হিসেব-নিকেশের আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কিনা। কারণ আমরা সকলেই জানি, জিরাফ একটি তৃণভোজী দীর্ঘগ্রীব প্রাণী। প্রায় সর্বদাই সে উদগ্রীব হয়ে থাকে। এবং আচরণে নিরীহ, শান্ত ও সরল। সর্বোপরি চিড়িয়াখানায় গেলেই তার সগৌরব সাক্ষাৎ মেলে।

কিন্তু এই মুহূর্তে যে জিরাফটিকে নিয়ে আমরা চুলচেরা হিসেব-নিকেশ করতে চাই, তার উচ্চতা মোটামুটি ৩২০ মিটার। ওজন ৭০ লক্ষ কিলোগ্রাম। এবং সে পুরোপুরি লোহার তৈরী।

১২,০০০ লোহার টুকরো ২৫ লক্ষ রিভেট দিয়ে জুড়ে দু-বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিচিত্র জিরাফটিকে জন্ম দিয়েছিলেন খ্যাপাটে ফরাসী প্রযুক্তিবিদ গুস্তাভ আলেক্সান্দার আইফেল।

হ্যাঁ, আইফেল টাওয়ারই হলো পৃথিবীর দীর্ঘতম অথচ সবচেয়ে কুৎসিত উদগ্রীব জিরাফ!

উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে দু-দুটো যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটে যায় বিজ্ঞানের জগতে। প্রথমটি হলো টেলিফোনের আবিষ্কার —আবিষ্কারক আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল। আর দ্বিতীয়টি, টমাস আলভা এডিসনের বৈদ্যুতিক বাল্‌ব আবিষ্কার। এই দুটো আবিষ্কার প্রযুক্তিবিদ আইফেলের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিলো। তিনি মরিয়া হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই বিজ্ঞান বিপ্লবের যজ্ঞে ফ্রান্সেরও কিছু ভূমিকা থাকা দরকার। এমন সময়ে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে সুযোগও এসে গেলো। যানবাহন ও ট্রেন চলাচলের জন্য বিভিন্ন সেতু তৈরির কাজে বিশাল বিশাল বহু ধাতব কাঠামো তৈরি করেছিলেন আইফেল। সুতরাং ১৮৮৯ সালের এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য ফরাসী সরকার আইফেলকে বললেন চমকদার কিছু একটা তৈরি করতে। প্রদর্শনীর তখনও পাঁচ বছর বাকি। আইফেল এক বিশাল মিনার

তৈরির পরিকল্পনা শুরু করলেন। তারপর কারিগরী ছবি আঁকার কাজ শুরু হলো। সুবিধের জন্য এই জাতীয় ছবি সাধারণত আসল জিনিসটার চেয়ে অনেক ছোট মাপে আঁকা হয়। ঠিক যে পদ্ধতিতে দেশ-বিদেশের মানচিত্র ছোট মাপে আঁকা হয়ে থাকে। কিন্তু আইফেলের উদ্ভট খেয়ালীপনা এমনই যে তিনি সমান মাপের কারিগরী ছবি আঁকতে নির্দেশ দিলেন। ফলে আইফেল টাওয়ারের ছবি আঁকতে তাঁর কাগজ লেগেছিল ৪১৮৫ বর্গমিটার!

১৮৮৭ থেকে ১৮৮৯, এই দু'বছরে তৈরি হলো আইফেল টাওয়ার। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এর ঠিক বছর তিনেক আগেই, আমেরিকার 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'র কাঠামো তৈরির কাজ শেষ করেছিলেন গুস্তাভ আইফেল। সুতরাং আইফেল টাওয়ার তৈরির পর তাঁর নাম হয়ে গেলো লোহার 'জাদুকর'।

১৮৮৯ সালের ১০ই জুন ইংল্যাণ্ডের রাজকুমার বার্টি উদ্বোধন করলেন এই আকাশছোঁয়া মিনারটির। রাজকুমার বার্টিই পরে হয়েছিলেন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড।

টাওয়ার তৈরি শেষ হওয়ার পর আনন্দ ও উৎসাহের আতিশয্যে আইফেল জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন, 'ফ্রান্সই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যার পতাকা-দণ্ড তিনশো মিটার উঁচু!' সত্যিই তো, যখন তৈরি হয়, তখন উচ্চতায় আইফেল টাওয়ারের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো কোনও কারিগরী নিদর্শন পৃথিবীতে ছিলো না। পরে অবশ্য অনেক গগনচুম্বী অট্টালিকা এবং বেতার যোগাযোগ স্তম্ভ আইফেল টাওয়ারকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছে।

শুনলে বিচিত্র মনে হতে পারে, টাওয়ারটি তৈরির সময় এবং পরেও ফ্রান্সের প্রথম সারির বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ফরাসী সরকারের কাছে। বলেছিলেন, রূপসী নগরী ফ্রান্সের বুকে এরকম কদর্য আকৃতির বস্তুর কোনও স্থান নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আইফেল টাওয়ার স্থায়ী হয়ে গেলো।

১৯০৯ সালে যখন প্রায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে টাওয়ারটিকে

ভেঙে ফেলা হবে, তক্ষুনি একটা দারুণ মতলব খেলে গেলো কারো কারো মাথায়ঃ টাওয়ারের চূড়ায় রেডিও টেলিগ্রাফের অ্যানটেনা বসিয়ে দিলে কেমন হয়? যেমন ভাবা সেই কাজ। ১৯০৯ সাল থেকে শুরু হলো আইফেল টাওয়ারের নতুন ভূমিকা, এবং তার অস্তিত্ব রক্ষা পেলো। যা প্রথমে ছিলো ৩০০ মিটার লম্বা, এখন অ্যানটেনা নিয়ে দাঁড়ালো ৩২০ মিটার।

চরিত্রে স্থূল হলেও আইফেল টাওয়ারের স্থাপত্যের আকর্ষণ নিয়ে আজ আর দ্বিমত নেই পৃথিবীতে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ১৯৭৬ সালে এই লোহার জিরাফটিকে দেখতে মোট ৩০ লক্ষ মানুষ প্যারিসে গিয়েছিলেন।

টাওয়ারের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে প্রশান্ত 'সেন' নদী; আর তার পাদদেশে রয়েছে 'সেন' নদী পর্যন্ত বিস্তৃত 'শাঁসে-দ্য-মার্স'। এখানে, আইফেল টাওয়ারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁর সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখতেন বলে শোনা যায়। এছাড়া, এই জিরাফটির জন্মদাতা গুস্তাভ আইফেলের একটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে টাওয়ারের নিচে। মূর্তিটি ফরাসী ভাস্কর বর্দেলির হাতে তৈরি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্রান্স আক্রমণকারী জার্মানরা ভেবেছিলো, এই নিষ্কর্মা লোহার জিরাফটিকে ভেঙে সেই লোহা-লক্কড় দিয়ে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক তৈরি করবে। কিন্তু পরে হয়তো অমানুষিক পরিশ্রমের কথা চিন্তা করেই তারা পিছিয়ে এসেছে। তবে তাদের কেউ কেউ আবার কাজটাকে অপবিত্র মনে করেও অন্যান্যদের বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলো।

সুতরাং, এতো ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়েও আইফেল টাওয়ার অক্ষত-অটল-অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

টাওয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে দিলে এক মায়াবী দৃশ্য নজরে পড়ে। বহু-দেখা জগৎটাকে টাওয়ারের ওপর থেকে দেখলে একেবারে নতুন মনে হয়। যেন ধাত্রীসুলভ প্রযত্ন ও পরিচর্যায়

একটা অপূর্ব স্বপ্নের গালিচা কেউ চারদিকে বিছিয়ে দিয়েছে। গুস্তাভ আইফেল কিন্তু কখনও ভাবেন নি, টাওয়ারের ওপর থেকে পৃথিবী দেখাটাই মানুষের কাছে এক অনমনীয় আকর্ষণ হয়ে পড়বে। এই আকর্ষণের উত্তরে মোট তিনটে মাচা রয়েছে আইফেল টাওয়ারে। প্রথমটি ৫৭ মিটার ওপরে, দ্বিতীয়টি ১১৫ মিটার, এবং তৃতীয়টির উচ্চতা ২৭৪ মিটার। ওঠানামার সুবিধের জন্য দু-দুটো লিফট রয়েছে জিরাফের কোনাকুনি দুটো পা বরাবর। আর যদি কেউ প্রচণ্ড পরিশ্রমী ও সাহসী হন, তাহলে ষোলো শো বাহান্নটি সিঁড়ির ধাপ ভেঙে স্বচ্ছন্দে উঠে যেতে পারেন ওপরে। আবহাওয়া কুয়াশাহীন পরিষ্কার থাকলে তৃতীয় মাচা থেকে ৬৭ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত যে কোনও দিকে পৃথিবীকে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হবে, প্যারিস ও তার শহরতলী নিখুঁত ভাবে আঁকা রয়েছে বিশাল কোনও মানচিত্রের বুকে। দূরের একটি জানালা দিয়ে গুস্তাভ আইফেলের ঘরের ভেতরটাও হয়তো দেখা যাবে অনায়াসে। কিন্তু দুঃখের কথা, খুব কম সময়েই আবহাওয়া এমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পাওয়া যায়। তবে এইভাবে পৃথিবী দর্শনের আদর্শ মাহেন্দ্রক্ষণটি হলো সূর্যাস্তের ঠিক একঘণ্টা আগে।

জিরাফের মোটামুটি পরিচয়ের পর খুব সহজেই আমরা হিসেব-নিকেশের আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারি।

সাধারণত যে দরে আমরা লোহা কিনে থাকি, ৭০০০ টনের এই জিরাফটিকে যদি নিছক সেই ওজনদরে কেউ বিক্রি করে দেন, তাহলে তিনি সরাসরি কোটিপতি হয়ে যাবেন—পেয়ে যাবেন মোটামুটিভাবে ৪৪,১০০,০০০ টাকা। আর যদি পুরোনো লোহার দর পান, তাতেও উপার্জন মন্দ হবে না—৭০,০০,০০০ টাকা।

আইফেল টাওয়ার তৈরির সময় ফরাসী সরকার গুস্তাভ আইফেলকে ২,৯২,০০০ ডলার দিয়েছিলেন। কিন্তু টাওয়ার তৈরিতে তাঁর খরচ হয়েছিলো ১০ লাখ ডলারেরও বেশি। সেই কারণে ফরাসী সরকার গুস্তাভ আইফেলকে বলেছিলেন, প্রথম কুড়ি বছরে দর্শনী

বাবদ টাওয়ারের যা আয় হবে, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু দেখা গেলো, মাত্র এক বছরেই দর্শকরা গুস্তাভকে তাঁর পাওনা প্রায় শোধ করে দিয়েছেন।

টাকা-পয়সার হিসেব ছেড়ে এবার অন্য হিসেবগুলো একটু খতিয়ে দেখা যাক।

কোনও মানুষ যখন চেয়ারে বসে থাকে, তখন সে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় চার কেজি ওজনের চাপ দিয়ে থাকে। শুনে বিশ্বাস হোক বা না হোক কথাটা সত্যি যে এই জিরাফটিও ঠিক একই রকম চাপ দিয়ে থাকে পৃথিবীর জমিতে। তার ওজন ৭০০০টন, তবে তার সঙ্গে আরও ৪০ টন হাত ধরাধরি করে থেকে যায় পৃথিবীর বুকে চাপ দেবার সময়ঃ সেটা হলো টাওয়ারের রঙের ওজন। প্রতি সাত বছর অন্তর নতুন করে রঙ করতে ৪০ টন হারে রঙ খরচ হয় আইফেল টাওয়ারের পিছনে।

টাওয়ারটি যে একেবারে অনড়-অটল তা কিন্তু নয়। ঝোড়ো বাতাস ও পাগলা হাওয়ায় তার মাথাটা সামান্য নড়েচড়ে বই কি! অতি সূক্ষ্ম মাপজোখে দেখা গেছে এই নড়াচড়াটা কখনই সাড়ে এগারো সেন্টিমিটারের বেশি হয়নি।

যদি ধরে নিই, প্যারিসের আবহাওয়া একেবারে ঝকঝকে, তকতকে, পরিষ্কার, এবং কোনও প্রকৃতি-প্রেমী উঠে গেছেন টাওয়ারের একেবারে চূড়ায়—৩২০ মিটার ওপরে, উদ্দেশ্য, দুচোখ ভরে দেখবেন সাধের পৃথিবীটাকে, তাহলে উদ্দেশ্য মাত্র ৪০,০০০ ভাগের এক ভাগ চরিতার্থ হবে। কারণ, ওপর থেকে পৃথিবীর যে অংশটুকু দেখা যাবে, সেটা মোটামুটি ১২,৮০০ বর্গ কিলোমিটার —ভূপৃষ্ঠের মোট ক্ষেত্রফলের ৪০,০০০ ভাগের মাত্র এক ভাগ। এই টাওয়ার যতো উঁচু হবে দর্শকের দেখা ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ততোই বাড়বে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে যখন টাওয়ারের উচ্চতা অসীমে পৌঁছে যাবে, তখন পৃথিবীর মোট ক্ষেত্রফলের অর্ধেক দেখা যাবে—অর্থাৎ ভূ-গোলকের একটা পিঠ! অবশ্য যদি তখন নজর পৃথিবীতে

এসে পৌঁছতে পারে, তবেই।

বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় নাকি জানা গেছে, মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে। এর মধ্যে আত্মহত্যার অন্যতম উৎকৃষ্ট পথ হিসেবে উঁচু জায়গা থেকে ঝাঁপ দেওয়ারও প্রবণতা কম নয়। এই কাজে অংশ নিয়েছে হাওড়া ব্রিজ, সুদূর অতীতে শহীদ মিনার, কখনো বা কোনও বহুতল বাড়ি। যদি কোনও কারণে কেউ আইফেল টাওয়ারকে বেছে নেন বৈতরণী পারের মহান উৎকৃষ্ট পথ হিসেবে, তাহলে তাঁকে সাবধান করতে অতিরিক্ত কয়েকটি হিসেব দেওয়া যাক।

এই জিরাফটির মাথা থেকে ঝাঁপ দিলে পৃথিবীর মাটিতে এসে পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় আট সেকেণ্ড—খুব হাওয়া-বাতাস থাকলে সময় হয়তো আরো বেশি লাগতে পারে। না, এই সময়টা খুব একটা কম নয়। কারণ যখন আমাদের বৈতরণী-পারের যাত্রী মাটি স্পর্শ করবেন, তখন তাঁর গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ২৮৩ কিলো-মিটার। অর্থাৎ রাজধানী এক্সপ্রেসের গতির প্রায় তিনগুণ। যদি এই গতিবেগ কেউ বজায় রাখতে পারেন, তাহলে মোটামুটি সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় তিনি দিল্লি পৌঁছে যাবেন। সুতরাং সাবধান!

শেষ করার আগে আর একটা বিচিত্র খবর দেওয়া যাক! বহুবিধ গুণাগুণ সম্পন্ন এই আইফেল টাওয়ারকে এক ঠগ একবার বিক্রি করে দিয়েছিলো এক বোকা খদ্দেরের কাছে। পরে অবশ্য ব্যাপারটা ধরা পড়েছিলো।

সুতরাং, এতো ঝড়-ঝাপটা মাথায় করেও এই সুবিশাল জিরাফ দীর্ঘ ৯৮ বছর ধরে একই রকম রয়েছে। আর মাত্র দু' বছর পরেই ১০০ বছরে পা দেবে গুস্তাভ আলেক্সান্দার আইফেলের এই লৌহ-তনয়। বলা যায় না, তখন হয়তো ফ্রান্সের মানুষই হবে প্রথম পৃথিবীবাসী, যারা কোনও জিরাফের শতবার্ষিকী সগৌরবে পালন করবে।

—

বিখ্যাত এই বিজ্ঞানী বেঁচে ছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বছর এবং তাঁর জীবনের সেরা উক্তি রানী ক্লিওপেট্রা সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন, 'ক্লিওপেট্রার নাকের গড়ন যদি অন্যরকম হতো তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসই বদলে যেতো।'

সংশয় জাগতে পারে অনেকের মনে। ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে মাথা ঘামায়, এ কেমনতরো বিজ্ঞানী! সত্যিই, এ-বিজ্ঞানী বড় অদ্ভুত। নইলে কখনও কেউ বলতে পারে, 'শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।' কিংবা 'ঈশ্বর বিনা মানবজাতি নিতান্তই অর্থহীন!' অথবা, 'যুক্তি নয়, বিশ্বাসেই রয়েছে মানুষের মুক্তির পথ।'

ভাবতে অবাক লাগে, প্রায় সারাটা জীবন ধরেই এরকম অদ্ভুত মন্তব্য করে গেছেন এই ফরাসী ভদ্রলোক। আর অদ্ভুত কাণ্ড? তাঁর প্রতিটি ক্রিয়াকাণ্ডই বলতে গেলে অদ্ভুত ছিলো। অবিস্মরণীয় প্রতিভা না থাকলে এরকম উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর অবাক-করে-দেওয়া আবিষ্কারের নজীর কারও পক্ষে রাখা সম্ভব নয়।

সুবিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর জীবনখাতার পাতাগুলো গোড়া থেকেই তাহলে ওল্টানো যাক। তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৬২৩-এর ১৯শে জুন, ফ্রান্সের অভার্ন্-এ। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ভীষণ রুগ্ন। একবার তো মরতে মরতে বেঁচে উঠেছিলেন। কিন্তু শরীর অসুস্থ হলে হবে কি, তিনি ছিলেন যাকে বলে শিশু-প্রতিভা। বাবা আতিয়েঁন ছিলেন অঙ্কে দক্ষ। ফলে একমাত্র ছেলের শিক্ষাদীক্ষার জন্য খুব চিন্তা ছিলো তাঁর। চাকরি করতেন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে : জেলা ত্রাণ দপ্তরের সভাপতি।

বাবার তত্ত্বাবধানে অল্পবয়েসেই অঙ্কে দক্ষ হয়ে উঠলো সুযোগ্য পুত্র। ছেলের অস্বাভাবিক ক্ষুরধার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন আতিয়েঁন। ভয় পেলেন, একসঙ্গে বহু বিষয় শিখে ফেলতে গিয়ে ছেলের মাথা না বিগড়ে যায়। সুতরাং আতিয়েঁন-এর মনে হলো,

অঙ্কের চর্চা আপাতত স্থগিত রেখে ছেলেকে প্রথমে প্রাচীন ভাষা শেখানোই বেশি প্রয়োজন। অথচ ছেলের তখন নেশা ধরে গেছে অঙ্কে। ফলে রীতিমতো শাসন করেই তার কাছ থেকে সমস্ত অঙ্কের বই সরিয়ে ফেললেন আতিয়েঁন। কিন্তু নিয়তি যার অঙ্ক ও বিজ্ঞান চর্চা, প্রাচীন ভাষা তাকে ধরে রাখে কেমন করে! বারো বছর বয়সে ছেলে একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করে বসলো, জ্যামিতি কাকে বলে। বাবা বললেন, বিভিন্ন আকার ও বস্তুর গঠন নিয়ে অঙ্কশাস্ত্রের যে শাখাটি তৈরি হয়েছে তারই নাম জ্যামিতি।

এর পরের ঘটনা অতি বড় বিশ্বাসীকেও চমকে দেবে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ঐ রুগ্ন কিশোর ইউক্লিডের জ্যামিতি বইয়ের প্রথম বত্রিশটি উপপাদ্য ঠিক ঠিক ক্রমানুসারে আবিষ্কার করে ফেললো। বাবা যখন এ-ঘটনার কথা জানতে পারলেন তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং ছেলের অঙ্কশেখার আগ্রহে আর বাধা দিলেন না। বরং ইউক্লিডের 'এলিমেন্ট্স্' বইটি তাকে উপহার দিলেন।

এরপর, মাত্র ষোলো বছর বয়েসে, আর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। জ্যামিতিক আকার ও গঠনের ওপরে একটা গোটা বই লিখে ফেললেন। এই বইতে মোট ৪০০টি জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে আলোচনা করা ছিলো। প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক এবং অঙ্কবিদ রেনি দেকার্ত-এর বয়েস তখন তেতাল্লিশ। তাঁকে দেখানো হলো ক্ষুদে বিজ্ঞানীর জ্যামিতিক আকার বিষয়ক পাণ্ডুলিপি। দেকার্ত তো হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, এ বই ষোলো বছরের ছেলের লেখা হতেই পারে না। তারপর এরকম সন্দেহও প্রকাশ করে বসলেন যে বইটি আসলে হয়তো ছেলের বাবা আতিয়েঁন-এর লেখা। কিন্তু আরও অবাক হওয়া তখনও বোধহয় বাকি ছিলো। কারণ মাত্র উনিশ বছর বয়েসে ঐ পণ্ডিত ছেলেটি আবিষ্কার করে বসলো পৃথিবীর প্রথম 'ডিজিটাল ক্যালকুলেটর'।

আতিয়েঁন তখন সরকারী চাকরি করেন। চাকরির প্রয়োজনে তাঁকে কর সংক্রান্ত বিভিন্ন হিসেব করতে হতো। বাবার কষ্ট দেখেই

উনিশ বছরের ছেলেটি তৈরি করেছিলো তার যন্ত্রগণক। ততোদিনে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সুতরাং রাজা এবং প্রধানমন্ত্রী যে তাকে যন্ত্রটি প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছিলেন সে আর আশ্চর্য কি! যন্ত্রটির পেটেন্ট নিয়ে তার একটি মডেল পাঠানো হয়েছিলো 'রয়্যাল প্যাট্রন অফ লার্নিং', সুইডেনের রানী ক্রিস্টিনার কাছে। এই যন্ত্র নিয়ে গবেষণার জন্য পরবর্তী কালে ছেলেটি রাজ-অনুদান পেয়েছিলো, এবং প্যারিসের সংগ্রহশালায় তার তৈরি একটি যন্ত্রগণক আজও সংরক্ষিত আছে।

তেইশ বছর বয়সে তুঁদে বিজ্ঞানীর আগ্রহ জন্মালো বায়ু-চাপের প্রতি। ইটালির পদার্থবিদ ইভাঙ্গেলিস্তা টরিসেলী মাত্র তিন বছর আগে, অর্থাৎ ১৬৪৩ সালে, পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজন আছে, ফলে তার চাপও আছে। এই চাপকে বলা হয় বায়ু-চাপ। টরিসেলী পরীক্ষা করে আরও প্রমাণ করলেন, ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ ৭৬ সেন্টিমিটার দীর্ঘ পারদস্তম্ভের চাপের সমান, অথবা প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় এক কিলোগ্রাম। বেশ কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা করার পর টরিসেলী লক্ষ্য করলেন পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা সব সময় ৭৬ সেন্টিমিটার থাকে না। অল্পস্বল্প বাড়ে কমে। যেহেতু পারদস্তম্ভের উচ্চতা নির্ভর করে বায়ুর চাপের ওপরে, টরিসেলী অনুমান করলেন ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ সব সময় সমান থাকে না, অর্থাৎ আমাদের বায়ুমণ্ডলের ওজন বাড়ে-কমে। টরিসেলী আরও বললেন, বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে গেলে পাওয়া যাবে মহাশূন্য —যার কোনও ওজন নেই। রেনি দেকার্ত কিন্তু এই মতের ঘোর বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, প্রকৃতিতে শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। তখন আমাদের ফরাসী বিজ্ঞানী এই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন।

বায়ুমণ্ডলের যদি সত্যিই ওজন থাকে তাহলে যতো ওপরে ওঠা যাবে ততোই তো বায়ুমণ্ডলের ওজন কমবে, অর্থাৎ বায়ুর চাপ কমবে। ব্যস, যা ভাবা তাই কাজ। আমাদের উৎসাহী যুবকটি

কাজে নেমে পড়লেন। যদি পাহাড়ে বেয়ে উঠে বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর চাপ মাপা যায় তাহলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে, উচ্চতা যতো বাড়ছে, বায়ুর চাপ ততো কমছে। অর্থাৎ খুব সহজ পরীক্ষাতেই প্রমাণ পাওয়া যাবে টরিসেলীর কথা ঠিক, না দেকার্ত ঠিক বলেছেন। পরীক্ষার জন্য দরকার শুধু একটা পারদের তৈরি ব্যারোমিটার— যা দিয়ে বায়ুর চাপ মাপা যায়, আর একটা পাহাড়। ব্যারোমিটার জোগাড় হলো, এবং পাহাড় হিসেবে তিনি বেছে নিলেন তাঁর জন্ম-স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত পাই-স্থ-দোম পাহাড়টিকে। কিন্তু নিজে তো ছোটবেলা থেকেই রোগে ভোগেন, অহজম, মাথাধরা সর্বদা লেগেই রয়েছে, তাছাড়া রয়েছে অনিদ্রা রোগ। সুতরাং, পাহাড়ে তাঁর ওঠা সাধ্যের বাইরে। তাই তিনি বেছে নিলেন তাঁর শক্তসমর্থ তরুণ ভগ্নীপতি মঁসিয়ে পেরিয়ারকে।

ব্যারোমিটার কাঁধে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন পেরিয়ার, এবং যথারীতি ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা কমতে লাগলো। অর্থাৎ বায়ুর চাপ কমছে! আমাদের বিজ্ঞানী টরিসেলীর মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন সগৌরবে। পাহাড় বেয়ে এক মাইল ওঠার পর পেরিয়ার দেখলেন পারদস্তম্ভের উচ্চতা ৭·৬ সে. মি. ইঞ্চি কমে গেছে। পাহাড়ে চড়তে পেরিয়ারের নিশ্চয়ই দারুণ ভালো লেগে থাকবে, কারণ একবার নয়, পাঁচ-পাঁচবার পাহাড়ে উঠে একই পরীক্ষা বার বার যাচাই করে নিলেন পেরিয়ার।

পাহাড়-পরীক্ষায় সফল হবার পরই অদ্ভুত বিজ্ঞানীর মতিগতি ঘুরে গেলো দর্শন ও ধর্মের দিকে। অবশ্য ইতিমধ্যেই তিনি তরলের চাপ, ঘাত বৃদ্ধির নীতি, প্রবাবিলিটি থিওরি বা সম্ভাবনা-তত্ত্ব, দ্বিপদ রাশি সংক্রান্ত বীজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি বহুমুখী বিষয়ে নিজের কৃতিত্ব জাহির করে ফেলেছেন। আজকের হাইড্রলিক ব্রেক এবং হাইড্রলিক প্রেস তাঁরই প্রতিভার ফলশ্রুতি। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম-মতে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ১৬৪৬ সালেই 'জ্যানসেনিস্‌ম্'-এর প্রভাবে পড়ে ধর্মান্তরিত হন। 'জ্যানসেনিস্‌ম্' মতে বিশ্বাসী ছিলো

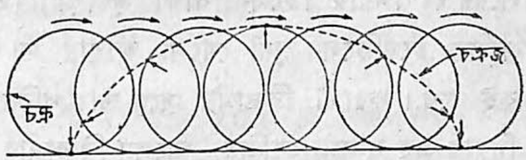
ক্যাথলিকদেরই খ্রীষ্টসঙ্ঘবিরোধী একটা অংশ।

১৬৫৪ সালে আর একবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে এই বিজ্ঞানী রেহাই পান। ঘোড়ার গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎই ঘোড়াগুলো গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে চলে যায়। এই দুর্ঘটনায় রেহাই পাওয়ার পর তাঁর ধর্মে মতি বেড়ে গেলো আরো বহুগুণ এবং জীবনের বাকি আট বছর কেটে গেলো ধর্মসংক্রান্ত লেখাপড়া জপতপ ও অসুস্থতা নিয়ে। 'জ্যানসেনিস্‌ম্‌'-এর শিক্ষার সপক্ষে তিনি 'প্রভিন্সিয়াল লেটার্স' নামে একটি বই লেখেন। এবং তার পরের বছরেই খ্রীষ্টধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে একটি বিশাল বই লেখার কাজ শুরু করেন। মৃত্যুর সময়েও বইটি শেষ হয়নি। ফলে তাঁর পাণ্ডুলিপির যেটুকু অংশ পাওয়া যায়, তা গ্রথিত করেই প্রকাশিত হয় 'পাঁসিস' বইটি। 'পাঁসিস' শব্দের অর্থ বিচিন্তা।

মাত্র এই দুটি বই তাঁকে এনে দেয় মরণোত্তর অসামান্য খ্যাতি। বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভলতেয়ার এ-দুটি বই পড়েই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অথচ জীবনের শেষ চোদ্দ-পনেরো বছরে এই ফরাসী বিজ্ঞানী মাত্র আট দিনের জন্য গণিতচর্চা করেছিলেন।

ঘটনাটি বড় অদ্ভুত। তখন তাঁর বয়েস পঁয়ত্রিশ বছর। বিছানায় শুয়ে দাঁতের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য তিনি জ্যামিতিশাস্ত্রের 'সাইক্লয়েড' বা 'চক্রজ' নামে একটি বক্র রেখার কথা চিন্তা করতে থাকেন। যন্ত্রণা ক্রমে কমতে লাগলো। তখন তিনি ভাবলেন, যন্ত্রণা যখন কমছে তখন ঈশ্বরের বিচারে তাঁর এই চিন্তা মোটেই অসৎ চিন্তা নয়। তারপর টানা আটদিন ধরে 'চক্রজ' নিয়ে ভেবে চললেন তিনি, এবং 'চক্রজ' সংক্রান্ত বহু সমস্যারই সমাধান করে ফেললেন।

'চক্রজ' কাকে বলে তা খুব সহজে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক, একটি গোলাকার চাকতির কিনারায় একটা ছোট বিন্দু আঁকা হলো। এবারে চাকতিটিকে যদি খাড়াভাবে গড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেটি ঠিক ছবির মতো এগিয়ে যাবে। তখন



তীরচিহ্ন নির্দেশ করা বিন্দুটি এগোবে ড্যাশ চিহ্ন দেওয়া বক্ররেখা বরাবর। এই বক্ররেখাটিকেই বলা হয় 'চক্রজ'। 'চক্রজ' রেখার দৈর্ঘ্য চাকতির ব্যাসের চার গুণ। ব্রিজ বা ট্রেন চলাচলের সুড়ঙ্গপথ নির্মাণের কাজে 'চক্রজ' রেখার বহু ব্যবহার পাওয়া যায়। এই বিশেষ জ্যামিতিক রেখাটির প্রতি বিভিন্ন সময়ে আগ্রহ অনুভব করেছেন গ্যালিলিও, স্যার ক্রিস্টোফার রেন এবং পর্তুগীজ বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইগেন্‌জ্‌।

এই আটদিন গণিত চর্চার পর বিজ্ঞানীর অসুস্থতা আরও খারাপ দিকে মোড় নেয়। একটানা অসহ্য মাথা যন্ত্রণা তাঁর চোখের ঘুম কেড়ে নেয় নির্মমভাবে। অবশেষে ১৬৬২-তে তিনি নিজের বসত-বাড়িটি ছেড়ে দেন এক দরিদ্র পরিবারকে। তারা সকলেই গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়েছিলো। এই ত্যাগ হয়তো তাঁর আত্মকৃচ্ছ্রের নজীর। এরপর তিনি তাঁর বিবাহিত বোনের বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। ১৬৬২-র ১৯শে আগস্ট নেমে আসে অসম্ভব যন্ত্রাণাময় মৃত্যু। পরে ময়না তদন্তে জানা যায় তাঁর করোটির গঠন বিকৃত ছিলো।

এই ফরাসী বিজ্ঞানীর জীবনের প্রতিটি ভাঁজে লুকিয়ে ছিলো নিয়তির পরিহাস। নইলে যে গণিতচর্চায় তিনি ছিলেন অমিত প্রতিভাশালী, সেই চর্চা তিনি রাতারাতি ত্যাগ করেন। অবশ্য তাঁর বক্তব্য ছিলো, এ কাজ তিনি করেছেন স্বয়ং ঈশ্বরের নির্দেশে। সত্যিই, কি বিচিত্র জীবন! বাবার আপত্তি ছিলো বলেই প্রথম জীবনে তিনি ঝুঁকেছিলেন জ্যামিতির দিকে ; দাঁতের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে শুরু করেছিলেন 'চক্রজ' নিয়ে গবেষণা ; আর সম্ভাবনা-তত্ত্বের গোড়াপত্তন করেছিলেন একজন পেশাদার জুয়াড়ীর অনুরোধে! সেই জুয়াড়ীকে পৃথিবীবাসী নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাবে।

শাভালিয়ের দা মিয়ার ছিলেন পাকা জুয়াড়ী। তিনি বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন জুয়া খেলে, আবার তা বিসর্জনও দিয়েছেন একই পথে। ফরাসী বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো। একদিন দা মিয়ার এক সমস্যা হাজির করলেন বিজ্ঞানীর দরবারে। সমস্যাটা এই রকম ঃ দুজন খেলোয়াড় ঘুঁটি চেলে জুয়া খেলছে। ধরা যাক যে আগে পাঁচ পয়েণ্ট পাবে সেই জিতবে। একজনের পয়েণ্ট তিন, অপর জনের দুই। টেবিলে মোট ৮০ টাকা জমা হয়েছে। যদি এমন সময় খেলা বন্ধ হয়, তাহলে দুজনে কি হিসেবে ঐ ৮০ টাকা ভাগাভাগি করে নেবে? অবশ্য ধরে নিতে হবে, দুজন জুয়াড়ী একই জাতের খেলোয়াড়; জেতার সম্ভাবনা দুজনেরই সমান সমান ছিলো।

আমাদের বিজ্ঞানী এই সমস্যা নিয়ে তৎক্ষণাৎ ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিলেন। এ-বিষয়ে পত্রালাপও করলেন অপর এক ফরাসী অঙ্কবিদ পিয়ের ফারমা-র সঙ্গে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো সম্ভাবনা-তত্ত্ব। মানুষ সেই প্রথম জানলো, অঙ্ক ও বিজ্ঞান চর্চায় সবসময় শতকরা একশোভাগ নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনা—এই দুটো বিষয় আজ বিজ্ঞানের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্যভাবে।

প্রসঙ্গ শেষ করার আগে ওপরের প্রশ্নটার উত্তর অনেকে হয়তো জানতে চাইবেন। কেউ বা অনুপাতের সাহায্যে হিসেব কষে বলবেন, টাকা ভাগ হবে ৪৮ ও ৩২, এই দুটো ভাগে। কিন্তু সম্ভাবনা-তত্ত্বের প্রয়োগে যে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে তা হলো ঃ ৫৫ টাকা ও ২৫ টাকা।

এই ফরাসী বিজ্ঞানীকে নিয়ে বহু কথাই বলা হলো, শুধু বলা হয়নি তাঁর নামটি। অনেকে হয়তো ইতিমধ্যেই সেটা অনুমান করে ফেলেছেন। আর যাঁরা পারেননি, তাঁরা হয়তো জানতে চাইবেন 'কি নাম এই অদ্ভুত বিজ্ঞানীর?' এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট উত্তর পাবেন ঃ ব্লাজ পাস্কাল!

ইমরান খান টুকটুকে লাল বল হাতে হাওয়ার বেগে ছুটে আসছেন। এদিকে ব্যাট হাতে রিচার্ডস্‌ও তৈরি। ফিল্ডাররা যার যার জায়গা মতো ওৎ পেতে রয়েছেন। আম্পায়ার ঝুঁকে পড়ে ধারালো চোখে লক্ষ্য করছেন খেলার প্রতিটি মুহূর্ত। টেনশনে থমথম করছে গোটা মাঠ। আর টিভির সামনে এই খেলা দেখতে দেখতে টেনশনে ডুবে আছি আমরাও।

গত ১৯৭৮-র অক্টোবরে ক্রিকেট বিশ্বকাপের খেলায় ঠিক এরকম একটি দৃশ্য বাস্তব হয়ে উঠেছিলো টেলিভিশনের পর্দায়। তখন জয়-পরাজয়ের সংশয়ের দোলায় দুলেছে দেশ-বিদেশের লক্ষ-কোটি টিভি-দর্শক। খেলার প্রতিটি মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে পৌঁছে গেছে হাজার হাজার মাইল দূরের সাগরপারে টেলিভিশনের আশ্চর্য পর্দায়।

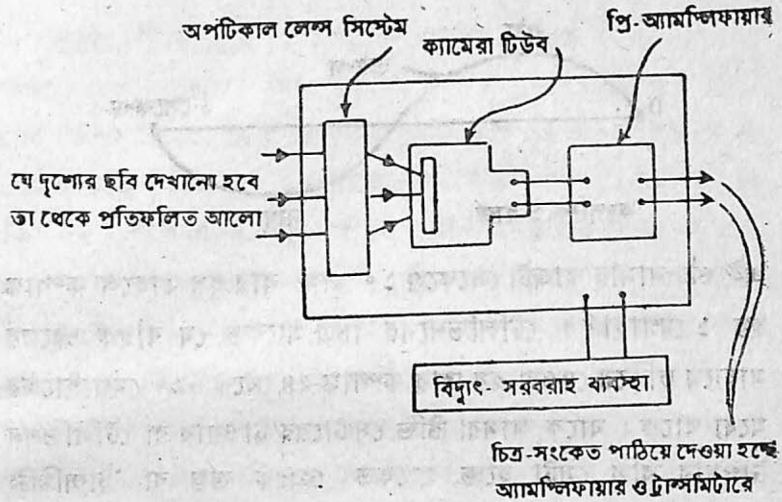
ভাবতে অবাক লাগে, কেমন করে দূর-বিদেশের খেলা আমরা সরাসরি টিভির পর্দায় দেখতে পাই! যদি প্রায় ১৩০০০ কিলোমিটার লম্বা একটা লৌহ শলাকা ভারতের মাটিতে গেঁথে দিয়ে পৃথিবীকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া যেতো, তাহলে শলাকার অন্য প্রান্ত বেরিয়ে পড়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটি ফুঁড়ে। অর্থাৎ, গোলাকার পৃথিবীর প্রায় দুটি বিপরীত প্রান্তে রয়েছে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত ওলিম্পিক গেম্‌স্‌ আমরা ভারতে বসেই টেলিভিশনে দিব্যি দেখতে পাই। তখন কি খেয়াল থাকে, যে শক্তি টেলিভিশনে দেখা চিত্র ও শব্দকে বয়ে নিয়ে আসছে তাকে প্রায় ১৯,৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হচ্ছে? এতোটা দূর-পথ পাড়ি দিয়ে আসে বলে টেলিভিশনের ছবি কি মূল ঘটনার চেয়ে দেরিতে আমরা দেখতে পাই? অর্থাৎ, মার্কিন মুলুকে কোনও খেলোয়াড় যখন হাই-জাম্প প্রতিযোগিতায় শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে, তখন কি আমরা টেলিভিশনে দেখবো যে সে হাই-জাম্প দেবার জন্য দৌড়ে আসছে? মোটেই না। কিন্তু এতো দূরে বসেও সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা 'চাক্ষুষ' করার ব্যাপারটা

সম্ভব হয় কেমন করে ? এর কারণ···

না, শুরুর থেকেই বরং শুরু করা যাক।

টেলিভিশনে কোনও ছবি দেখাতে গেলে প্রথম কাজ হলো টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সেই ছবিকে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত করা। অর্থাৎ, খেলার মাঠে প্রতি মুহূর্তে যে-সব ঘটনা ঘটছে তার দিকে তাক করে থাকে একাধিক টিভি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাগুলো অনেকটা দর্শকের চোখের মতো কাজ করে। আমরা যখন কোনও জিনিস বা ঘটনার দৃশ্য দেখি, তার অর্থ সেই দৃশ্য থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে। যদি আলো না থাকে, তাহলে কোনও দৃশ্যই আমাদের চোখে ধরা দেবে না। কারণ কোনও আলোকরশ্মি তখন দৃশ্যের বিভিন্ন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসবে না। দিনের বেলা যখন খেলা হয় তখন আলোর উৎস সূর্য। আর নৈশ খেলায় ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম আলো। যেমন, হ্যালোজেন বাতি।

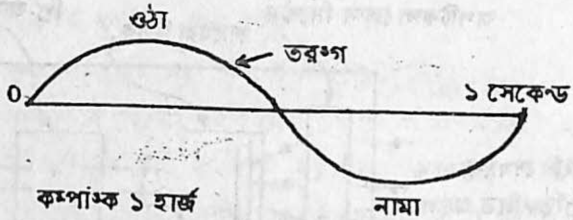
যে কোনও দৃশ্যই আলো ও ছায়া দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ, আলো ও ছায়ার অসংখ্য বিন্দু দিয়েই তৈরি হয় কোনো দৃশ্য বা ছবির নকশা। কোনও সাধারণ ফটোগ্রাফ খুঁটিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। টিভি-ক্যামেরায় কোনও ফিল্ম থাকে না। তার বদলে থাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্যামেরার প্রথমেই যে অংশটি থাকে সেটি হলো 'অপটিকাল লেন্স সিস্টেম'। এর মধ্যে কতকগুলো সূক্ষ্ম ও নিখুঁত লেন্সের সমষ্টি থাকে। ক্যামেরায় যে-দৃশ্যের ছবি 'ধরা' হবে তা থেকে প্রতিফলিত আলো এই লেন্স সমষ্টির ওপরে এসে পড়ে। লেন্স সমষ্টি সেই আলো যথাযথভাবে ফোকাস করে ফেলে টিভি ক্যামেরার দ্বিতীয় অংশ 'ক্যামেরা-টিউব'-এর ওপরে। 'ক্যামেরা-টিউব'ই হলো টিভি ক্যামেরার প্রাণ। কারণ, যে আলোকরশ্মি তার ওপরে এসে পড়ে তা থেকে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সংকেত বা 'ইলেকট্রিক সিগনাল' তৈরি করে 'ক্যামেরা টিউব'। 'ক্যামেরা-টিউব' নানারকমের হয়। যেমন, ইকনোস্কোপ, ইমেজ ডিসেক্টর, এমিট্রন, প্লাম্বিকন,



টিভি ক্যামেরার বিভিন্ন অংশ

ভিডিকন, অর্থিকন ইত্যাদি। 'ক্যামেরা-টিউব' এ উৎপন্ন বৈদ্যুতিক সংকেত 'ইনপুট' বা 'নিবেশ' হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় টিভি ক্যামেরার শেষ অংশ 'প্রি-অ্যামপ্লিফায়ার'এ। 'প্রি-অ্যামপ্লিফায়ার' এক ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার যা বৈদ্যুতিক সংকেতকে পরিবর্ধনের কাজ করে। এই পরিবর্ধিত সংকেতকে আরও জোরালো ও নিখুঁত করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় নানা অ্যামপ্লিফায়ার ও নিয়ন্ত্রণ-বর্তনির মধ্যে। সেখান থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত চলে যায় 'ভিশন-ট্রান্সমিটার' বা চিত্র-প্রেরক যন্ত্রে। চিত্র-প্রেরক যন্ত্রে যে বৈদ্যুতিক সংকেত পৌঁছয় তাকে বলা হয় 'ভিডিও সিগন্যাল' বা চিত্র-সংকেত।

এক-একটি টেলিভিশন সেট হচ্ছে এক-একটি গ্রাহক যন্ত্র। এই গ্রাহক যন্ত্রের কাজ হলো চিত্র-সংকেত গ্রহণ করে তা থেকে ছবি ফুটিয়ে তোলা। সুতরাং চিত্র-সংকেতকে বিভিন্ন দিকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। চিত্র-সংকেতকে অক্ষত-অবিকৃতভাবে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে গেলে প্রয়োজন হয় উচ্চ কম্পাঙ্কের একটি 'ক্যারিয়ার ওয়েভ' বা বাহক তরঙ্গ। কোনও তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে একবার ওঠা-নামা করলে তার কম্পাঙ্ক হয় ১ হার্জ। যদি



এই ওঠা-নামার কাজটা সেকেণ্ডে ১০ লক্ষ বার হয় তাহলে কম্পাঙ্ক হয় ১ মেগাহার্জ। টেলিভিশনের চিত্র-সংকেত যে বাহক তরঙ্গের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তার কম্পাঙ্ক ৫৪ থেকে ৮৯০ মেগাহার্জের মধ্যে থাকে। যাকে আমরা টিভি সেণ্টারের টাওয়ার বা টেলিভিশন টাওয়ার বলি সেটা হচ্ছে সংকেত প্রেরক স্তম্ভ বা 'ট্রান্সমিটিং টাওয়ার'। সেই টাওয়ারের অ্যাণ্টেনার সাহায্যেই বাহক তরঙ্গ বাহিত চিত্র-সংকেত বা 'মডিউলেটেড ভিডিও সিগন্যাল' চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

এ তো গেল চিত্র-সংকেতের কথা। টিভিতে আমরা শুধু যে ছবি দেখি তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শব্দও শুনতে পাই। যে দৃশ্যটি টিভিতে দেখানো হবে তার আনুষঙ্গিক শব্দগুলো ধরা হয় মাইক্রোফোনে। টিভি ক্যামেরা যেমন ছবিকে বৈদ্যুতিক সংকেতের রূপ দেয়, তেমনি মাইক্রোফোন শব্দকে পরিণত করে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সংকেতে। সেই সংকেতকে অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে পরিবর্ধিত করে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ-বর্তনির মাধ্যমে পাওয়া যায় 'অডিও সিগন্যাল' বা শব্দ-সংকেত। এই শব্দ-সংকেতকে চিত্র-সংকেতের সঙ্গে 'সমলয়ে' রেখে ভিন্ন কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের সাহায্যে একই 'ট্রান্সমিটিং টাওয়ার' থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। চিত্র ও শব্দ-সংকেতের 'লয়' যদি একই না হয় তাহলে টেলিভিশনে দেখা ছবি ও শব্দের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে। যেমন, ব্যাটসম্যান বল মারার পর যখন তা ফিল্ডারের হাত ঘুরে বোলারের হাতে ফিরে এলো, তখন হয়তো শোনা যাবে ব্যাটে-বলে সংঘর্ষের 'খটাস' শব্দ। এই কারণেই চিত্র ও শব্দ-সংকেতকে সমলয়ে প্রচার করা হয়।

সুতরাং 'ট্রান্সমিটিং টাওয়ার'-এর মাধ্যমে চিত্র ও শব্দ-সংকেত অদৃশ্য বেতার-তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। এখন সেই তরঙ্গ থেকে ছবি ও শব্দ তৈরি করে নেওয়াটা টেলিভিশন সেটের কাজ। চিত্র ও শব্দ-সংকেতের বেতার-তরঙ্গ দুটির কম্পাঙ্ক ভিন্ন হয়। ফলে একই সঙ্গে প্রেরিত হলেও প্রয়োজন মতো সংকেত দুটিকে আলাদা করে নেওয়া যায়। সংকেত গ্রাহক-যন্ত্র বা টেলিভিশন সেট ঠিক এই কাজটিই করে। চিত্র ও শব্দের বেতার-সংকেত গ্রহণ করে টেলিভিশনের অ্যান্টেনা পাঠিয়ে দেয় টিভির ভেতরে। যাতে নির্বাধায় বেতার-সংকেত গ্রহণ করা যায় সেই জন্যে অ্যান্টেনা সাধারণত লাগানো হয় বাড়ির ছাদে। সংকেত দুটি টিভির ভেতরে পৌঁছলে সেখানে তাদের আলাদা করে নেওয়া হয়। এই কাজটি করে বিশেষ ইলেকট্রনিক বর্তনি—যাদের কাজই হলো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক সংকেতকে 'ছেঁকে' আলাদা করে নেওয়া। চিত্র ও শব্দ-সংকেতের কম্পাঙ্ক ভিন্ন হওয়ার ফলে ইলেকট্রনিক 'ফিল্টার' বা 'ছাঁকনি' সহজেই তাদের আলাদা করে নিতে পারে। তারপর চিত্র-সংকেত অনুযায়ী টিভি ক্যামেরায় 'ধরা' দৃশ্যটি পুনর্গঠিত হয় টেলিভিশন পর্দায়, আর শব্দ-সংকেত অনুযায়ী টিভির ভেতরের স্পিকার উপযুক্ত কথা বা শব্দ শুনিয়ে দেয় আমাদের।

টিভিতে ছবি ঠিক কিভাবে পুনর্গঠিত হয় এবারে সেটা একটু বিশদভাবে দেখা যাক।

টেলিভিশনে মূলত কোনও স্থির ছবির পুনর্গঠন করা হয়। কিন্তু অনেকগুলো স্থির ছবিকে পরপর খুব দ্রুত দেখানোর ফলে আমাদের মনে হয় যে চলচ্চিত্র দেখছি। অর্থাৎ ছবির পাত্র-পাত্রীরা 'জীবন্ত' হয়ে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। এই চলচ্চিত্রের প্রত্যেকটি স্থির ছবি অসংখ্য ছোট ছোট আলোক-বিন্দু ও ছায়া-বিন্দুর সমষ্টি। সাদা-কালোয় ছাপা কোনও ছবিকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে ছোট ছোট সাদা এবং কালো ফুটকি দেখা যাবে। সাদা কাগজের ওপরে যদি ছবিটি ছাপা হয়, তাহলে শুধুমাত্র কালো ফুটকির ঘনত্ব কমিয়ে বা

বাড়িয়েই প্রয়োজন মতো হালকা বা গাঢ় ছাই রঙ, অথবা ঘন কালো রঙ ফুটিয়ে তোলা যায়। রঙিন ছবির ক্ষেত্রেও এই একই নীতি ব্যবহার করা হয়। সেখানে একাধিক রঙের রঙিন ফুটকি নানা অনুপাতে মিলেমিশে রঙিন ছবি তৈরি করে। এখানে মনে রাখতে হবে, সাদা-কালো টিভি ও রঙিন টিভির মূল নীতি একই—যদিও অতিরিক্ত কিছু যন্ত্রাংশ সেখানে প্রয়োজন হয় এবং টেলিভিশন পর্দাটিও হয় বিশেষ ধরনের।

কোনও ছবির প্রত্যেকটি ছোট আলোকিত বা অন্ধকার অংশকে বলা হয় 'পিকচার এলিমেন্ট'—সংক্ষেপে যার নাম 'পিক্সেল্' বা 'পেল্'। অসংখ্য 'পেল্' একজোট হয়ে তৈরি হয় সম্পূর্ণ একটি ফটোগ্রাফ।

টেলিভিশনে ছবি তৈরি হওয়ার নীতি ঠিক ফটোগ্রাফের মতো নয়। সেখানে ফুটকির বদলে ব্যবহার করা হয় সমান্তরাল সরু রেখা। খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করলে টিভির পর্দায় ফুটে-ওঠা ছবিতে এরকম অগুনতি সরু সরু রেখা দেখা যায়। চিত্র-সংকেত অনুযায়ী এই রেখাগুলো জায়গায় জায়গায় সাদা বা কালো হয়ে যায়। তখন সব কটি রেখার সাদা ও কালো অংশ মিলে তৈরি হয় সাদা-কালো ছবি। তবে ছাপা ছবির সাদা-কালো ফুটকির মতো টিভির রেখার সংখ্যার ঘনত্বের কোনও হেরফের হয় না। রেখাগুলো খুব সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে একটু দূর থেকে টিভির ছবি দেখলে সেগুলো আর আলাদা করে আমাদের চোখে পড়ে না—অনেকটা ফটোগ্রাফের সূক্ষ্ম 'পেল্'-এর মতো।

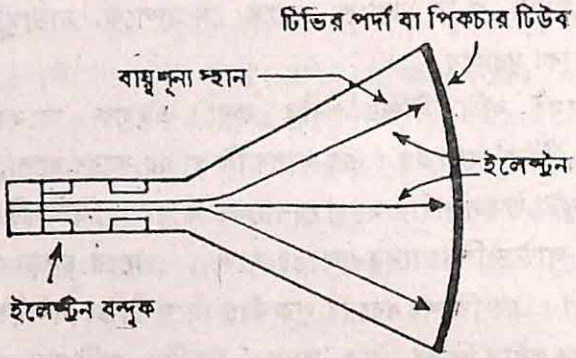
ফটোর বেলায় গোটা ছবিটা একই সঙ্গে ফিল্মের ওপরে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ, সব কটি 'পেল্'ই একসঙ্গে তৈরি হয়। কিন্তু টেলি-ভিশনের ছবির ক্ষেত্রে ঘটনাটা অন্যরকম। সেখানে সরু সরু সূক্ষ্ম উজ্জ্বল রেখাগুলো খুব দ্রুতগতিতে পরপর 'এঁকে' ফেলা হয়। 'আঁকার' এই কাজটি করে সূক্ষ্ম পারমাণবিক কণা 'ইলেকট্রন'। কিন্তু কাজটি সে কেমন করে হাসিল করে? এর উত্তর জানতে হলে টিভির

ভেতরে প্রধান কি কি যন্ত্রাংশ আছে সে-সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার।

প্রথমেই বলি, টিভির পর্দার কথা। এটাকে অনেক সময় 'পিকচার টিউব' বলা হয়। এর কারণ কি? এর কারণ হলো, বাইরে থেকে একটা উত্তল পর্দার মতো দেখালেও আদতে জিনিসটি দেখতে অনেকটা লাউড-স্পিকারের চোঙের মতো। চোঙের চওড়া প্রান্তটিই হলো পর্দা। এক বিশেষ ধরনের পুরু কাঁচ দিয়ে টিভির পর্দা তৈরি করা হয়। আর পর্দার ভিতর দিকে 'ফসফর' জাতীয় প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ থাকে। 'পিকচার টিউব'এর সরু প্রান্তের দিকে থাকে একটি 'ইলেকট্রন বন্দুক'। ইলেকট্রন বন্দুক থেকে বর্শার ফলার মতো সূক্ষ্ম কণা ইলেকট্রনের তীক্ষ্ণ স্রোত বেরিয়ে আসে। এই স্রোত যখন পর্দার প্রতিপ্রভ আস্তরণের ওপর আছড়ে পড়ে তখন সেখানে দেখা যায় একটি উজ্জ্বল আলোক-বিন্দু। আর যেখানে কোনও কণা এসে আঘাত করে না সেখানে কোনও আলোক-বিন্দু তৈরি হয় না—ফলে পাওয়া যায় ছায়া-বিন্দু। এইরকম অসংখ্য আলোক-বিন্দু ও ছায়া-বিন্দু মিলেই তৈরি হয় একটি সম্পূর্ণ ছবি।

সব পদার্থের মধ্যেই ইলেকট্রন আছে। এই ইলেকট্রনগুলো পদার্থের ভেতরে যেমন থাকে, তেমনি পদার্থের মুক্ত তলেও থাকে। কোনও ধাতব পদার্থকে উত্তপ্ত করে ইলেকট্রন কণাকে মুক্ত করা সম্ভব। ইলেকট্রন বন্দুকে একটি ধাতব তড়িৎদ্বারকে উত্তপ্ত করে ইলেকট্রন কণা মুক্ত করা হয়। তারপর ধনাত্মক তড়িৎদ্বারের আকর্ষণে ঋণাত্মক কণা ইলেকট্রন ছুটে যায় টিভির পর্দার দিকে। এই কাজের জন্য বিভিন্ন বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র ও চৌম্বক-ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রন কণা ছুটে যাওয়ার পথে যাতে কোনওরকম বাধা না পায় সে-জন্য 'পিকচার টিউব' এর ভিতরটা বায়ুশূন্য করা থাকে।

ইলেকট্রন বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনের তীক্ষ্ণ স্রোত অনেকটা কলমের নিবের মতো আঁচড় টেনে চলে টিভির পর্দার ওপরে। যেমন করে আমরা সাদা কাগজে লিখি ঠিক সেভাবে



অন্ধকার পর্দার ওপরে 'ইলেকট্রনের নিব' বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সরু সরু আলোর দাগ টেনে চলে। এই কাজটিকে পরিভাষায় 'স্ক্যানিং' বলা হয়।

টিভি ক্যামেরার 'ক্যামেরা টিউব-'এ যখন কোনও দৃশ্য 'ধরা' হয় তখন তাকেও একইভাবে 'স্ক্যানিং' করা হয়। এর ফলে যে কোনও ছবিকে ছোট ছোট 'পিকচার এলিমেন্ট'-এ ভাগ করে নেওয়া যায়। টেলিভিশন সেট-এ চিত্র-সংকেত থেকে সেই 'পিকচার এলিমেন্ট' গুলোকেই ইলেকট্রনের রেখা দিয়ে পুনর্গঠন করা হয়। 'স্ক্যানিং'এর সময়ে ইলেকট্রনের স্রোত যখন বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এক একটি রেখা টানে, তখন সেই রেখার ওপরে যে কটি 'পিকচার এলিমেন্ট' থাকে তার সব কটিকেই সে ছুঁয়ে যায়। একটি রেখা টানা হয়ে গেলে ইলেকট্রন বন্দুক 'ইলেকট্রন-নিব'টিকে ডান প্রান্ত থেকে তুলে নিয়ে যায় বাঁ প্রান্তে। তারপরে প্রথম রেখার সামান্য নিচ থেকে আবার টানতে শুরু করে নতুন রেখা—ঠিক কাগজে কলম দিয়ে দ্বিতীয় লাইন লেখার মতো। এক একটি রেখা টানা হয়ে গেলে 'নিব'কে বাঁ প্রান্তে খুব দ্রুত ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এই কাজটিকে বলা হয় 'রিট্রেস' বা 'ফ্লাই ব্যাক'।

কোনও একটি স্থির ছবিকে টিভিতে দেখাতে হলে তাকে 'ক্যামেরা টিউব'-এ একই রকমভাবে সরু রেখা দিয়ে 'স্ক্যান' করতে হবে। তারপরে টেলিভিশনের পর্দায় সেই ছবিটিকে পুনর্গঠন করতে গেলে

ছবি থেকে 'ক্যামেরা টিউব'-এর মাধ্যমে পাওয়া চিত্র-সংকেত অনুযায়ী ইলেকট্রন বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রন কণার সংখ্যাকে কম-বেশি করতে হবে। ফলে পর্দায় 'ইলেকট্রনের নিব' যে-রেখাগুলো আঁকবে তাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হবে। নিব দিয়ে টিভি পর্দার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত যখন সব কটি সরু রেখা টানা হয়ে যাবে, তখনই আমরা দেখতে পাবো পুনর্গঠিত ছবি।

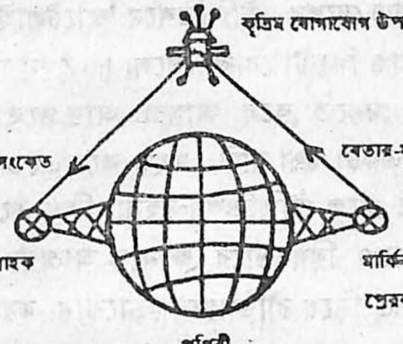
'পিকচার এলিমেন্ট'-এর সংখ্যা যতো বেশি হবে, পুনর্গঠিত ছবি ততোই নিখুঁত হবে। সেই কারণেই টেলিভিশনের সরু রেখাগুলো বা 'স্ক্যানিং লাইন'-এর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি রাখা হয়। সাধারণত এই সংখ্যাটি হয় ৫২৫ কিংবা ৬২৫। সুতরাং একটি স্থিরচিত্র পর্দায় আঁকতে গেলে 'ইলেকট্রন-নিব'কে অন্তত ৫২৫টি রেখা টানতে হবে। মনে হতে পারে, এতোগুলো রেখা যখন টানা হয় তখন আমরা সেটা ধরতে পারি না কেন ? এর কারণ 'ইলেকট্রন-নিব' কাজ করে খুব তাড়াতাড়ি। ৫২৫টি রেখা টানতে তার সময় লাগে মাত্র ১/৩০ সেকেণ্ড। অর্থাৎ, এক সেকেণ্ডে সে ৩০টি ছবি দর্শকের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারে। 'ইলেকট্রন-নিব' এর তৈরি করা ৫২৫ লাইনের এক একটি ছবিকে বলা হয় 'ফ্রেম'। এক সেকেণ্ডে ৩০টি 'ফ্রেম' দেখানো হয় বলেই টিভিতে চলচ্চিত্র দেখতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। এই ৩০টি ফ্রেমের সমস্ত সরু রেখাগুলোর দৈর্ঘ্য যোগ করলে হয় প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার ! সুতরাং 'ইলেকট্রন-নিব'-এর রেখা আঁকার গতিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার।

আমরা যখন কোনও জিনিস দেখি তখন জিনিসটি হঠাৎ করে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিলেও তার ছবি প্রায় ১/১০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয় অক্ষিপটে। এই ঘটনাকে বলা হয় 'পারসিস্টেন্স অফ ভিসন' বা 'দৃষ্টির স্থায়িত্ব'। এই কারণেই খুব তাড়াতাড়ি পর পর কয়েকটি ছবি আমাদের চোখের সামনে ধরলে আমাদের মনে হয় যেন চলমান ছবি দেখছি। অর্থাৎ 'দৃষ্টির স্থায়িত্ব'-এর জন্যেই আমাদের পক্ষে

চলচ্চিত্র দেখা সম্ভব হয়। আর একই কারণে টেলিভিশনের পর্দায় সেকেণ্ডে ফুটে ওঠা ৩০টি ফ্রেম টিভিতে চলচ্চিত্র দেখতে আমাদের সাহায্য করে।

এবারে একটা প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে। সেটা হলো, এতো ঘটনার ঘনঘটা পেরিয়ে কোনও দৃশ্যের ছবি কি করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় আমাদের টেলিভিশন সেটের পর্দায়? এর উত্তর খুব সহজ। 'ক্যামেরা টিউব'-এর 'স্ক্যানিং'-চিত্র-সংকেত তৈরি হওয়া, 'ট্রান্সমিটিং টাওয়ার' থেকে সংকেতের বেতার-তরঙ্গ আমাদের টেলিভিশনের অ্যান্টেনায় পৌঁছে যাওয়া, টেলিভিশনের ভিতরে চিত্র ও শব্দ-সংকেত 'ছেঁকে' আলাদা করে নেওয়া, আর সব শেষে 'স্ক্যানিং' ক্রিয়ার মাধ্যমে টিভি-র পর্দায় ছবি ফুটিয়ে তোলা, এই সবগুলো কাজই ঘটে যায় খুব দ্রুতগতিতে। এর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত ঘটনা হলো 'ট্রান্সমিটিং টাওয়ার' থেকে টেলিভিশন সেটের অ্যান্টেনায় বেতার-তরঙ্গের পৌঁছে যাওয়া। কারণ, বেতার-সংকেত এই দূরত্ব অতিক্রম করে আলোর গতিতে, অর্থাৎ, প্রতি সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বেগে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, এই বেগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে আসতে সংকেতের সময় লাগবে মাত্র ০·০৬৫ সেকেণ্ড বা এক সেকেণ্ডের প্রায় পনেরো ভাগের এক ভাগ। এ ছাড়া অন্যান্য কাজগুলোর জন্যে যদি মোট একই রকম সময় লাগে তাহলে সব কাজ মিলিয়ে আসল দৃশ্যের ঘটনা ও টিভিতে দেখা সেই ঘটনার ছবির তফাৎ হবে মাত্র ০·১৩ সেকেণ্ড বা ১ সেকেণ্ডের প্রায় সাড়ে সাত ভাগের এক ভাগ। সুতরাং এই কারণেই পৃথিবীর অপর প্রান্তের ঘটনাও আমরা টেলিভিশনে বলতে গেলে একরকম সঙ্গে সঙ্গেই 'চাক্ষুষ' করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ঐরকম কোনও দূর দেশ থেকে টেলিভিশনের বেতার-সংকেত সরাসরি ভারতে এসে পৌঁছতে পারে না। কারণ সংকেতের বেতার-তরঙ্গ ছুটে চলে সরলরেখায়, অথচ পৃথিবীর আকার গোল। সুতরাং মার্কিন



যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত সংকেত প্রথমে পৌঁছয় মহাকাশে ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করা কোনও 'স্যাটেলাইট' বা 'উপগ্রহ'তে। তারপর সেখান থেকে সংকেতকে পুনঃপ্রেরণ করা হয় ভারত লক্ষ্য করে। এই উপগ্রহকে বলা হয় কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ বা 'আরটিফিসিয়াল কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট'। এই সব উপগ্রহকে বিষুবরেখা বরাবর ভূসমলয় কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। তার ফলে উপগ্রহগুলো পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একইভাবে ঘুরে চলে। সুতরাং উপ-গ্রহগুলোকে যে দেশের 'আকাশে' স্থাপন করা হয়, তারা সেই দেশের ওপরেই বরাবর থাকে। পৃথিবীর আবর্তন এই আপেক্ষিক অবস্থানের নড়চড় ঘটাতে পারে না। অতএব উপগ্রহগুলো বেতার-সংকেত আদান-প্রদানের কাজটিকে সম্ভব করে তোলে। দূর দেশ থেকে আসা এই বেতার-তরঙ্গ মূলত 'মাইক্রোওয়েভ' বা 'মাইক্রোতরঙ্গ'। মাইক্রোতরঙ্গের কম্পাঙ্ক ১০০০ মেগাহার্জ থেকে ৩,০০,০০০ মেগাহার্জ পর্যন্ত হতে পারে। বহুদূরের পথ অতিক্রম করতে বেতার-সংকেতের যে শক্তিক্ষয় হয় তা পূরণ করে দেওয়া হয় পরিবর্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

সুতরাং গত নভেম্বর মাসে কলকাতায় যে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো তা কেমন করে টেলিভিশনে আমরা দেখতে পেলাম সে-সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেলো। আর

একই সঙ্গে সেই খেলার দৃশ্য কেমন করে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের টেলিভিশনে 'স্যাটেলাইট'-এর মাধ্যমে পৌঁছে গেছে তাও কিছুটা বোঝা গেলো। এখন নিশ্চয়ই টিভিতে কোনও অনুষ্ঠান দেখতে বসে আমরা আর ততোটা অবাক হবো না। তবে শেষে একটা কথা বলি, সহজ করে এতো কথা বললেও খুব খুঁটিয়ে দেখতে গেলে টেলিভিশন-রহস্য কিন্তু এতো সহজ নয়। এ-বিষয়ে যারা আরও বিশদভাবে জানতে আগ্রহী তাদের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ স্বতন্ত্র বইপত্র নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা করতে হবে।

পুরাকালে ধারণা ছিলো পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্রে রয়েছে। আর বিশ্বাস ছিলো মানুষ ঈশ্বরের সন্তান—বিশ্বজগতের সেরা বুদ্ধিমান প্রাণী। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের এই দুটি ধারণাই গেছে বদলে। মানুষ জেনেছে, পৃথিবী মোটেই বিশ্বজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত নয়। আরও জেনেছে, মহাবিশ্বের অন্য কোনও গ্রহে মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজ পাওয়াটা নেহাত অসম্ভব নয়।

প্রাচীনকালে কোনও কোনও দার্শনিক অবশ্য বিশ্বাস করতেন বিশ্বজগতের অন্য কোনও গ্রহে পৃথিবীর মতোই প্রাণের বিকাশ ঘটা সম্ভব। যেমন ৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক চিওসের মেট্রোডোরাস লিখেছিলেন, 'এক বিশাল জমিতে মাত্র এক গুচ্ছ গম থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনই অসীম মহাবিশ্বে একটি মাত্র প্রাণীজগৎ থাকাটাও অবাস্তব।' এই সংশয় নিয়ে দার্শনিক তর্ক-বিতর্ক চলেছে বহুকাল ধরে। কেউ বলেছেন, আমাদের সৌরজগতের মতো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সৌরজগৎ রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডে। সেখানে রয়েছে অসংখ্য গ্রহ। তাদের একটিও কি পৃথিবীর মতন নয়? সবগুলোই কি অনুর্বরা, বন্ধ্যা? সেখানে কি ঘটতে পারে না প্রাণের বিকাশ? থাকতে পারে না বুদ্ধিমান প্রাণী? কোনও কোনও দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এই প্রকল্পের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, না, বিশ্বজগতে আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান জীব। যেহেতু স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণই কেউ দাখিল করতে পারেননি তাই বিতর্কও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এবং আজও অব্যাহত রয়েছে।

এ-বিষয়ে প্রথম সরাসরি পদক্ষেপ বিজ্ঞানী জোহান কার্ল গাউস-এর। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পিথাগোরসের উপপাদ্যটি বিশাল মাপে চিত্রিত করা হোক পৃথিবীর জমিতে। একটি অতিকায় সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা হোক উত্তর রাশিয়ায়। আর সেই ত্রিভুজের তিন বাহু সংলগ্ন তিনটি বর্গাকার পাইন গাছের জঙ্গল চাষ করা হোক। তাহলে মহাকাশের উড়ন্ত যান থেকে ভিন গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা এই

জ্যামিতিক উপপাদ্যটি দেখতে পাবে এবং পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাউস-এর প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

এর পরে ভিন্‌গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বহু নতুন নতুন প্রস্তাব এসেছে, চেষ্টাও হয়েছে। যেমন, বিশাল বৃত্তাকার অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তাদের জানানো যে গণিতের 'শূন্য' প্রতীকটি মানুষের জানা আছে। ১৮৬৯-তে ইংরেজ রসায়নবিদ চার্লস ফ্রেডরিক ক্রস সারা ইওরোপ জুড়ে দৈত্যাকার আয়না লাগানোর প্রস্তাব দেন। এই আয়না সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে ফেলবে মঙ্গল গ্রহে। তাতে মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা মানুষের কথা জানতে পারবে। বলা বাহুল্য, সে সময়ে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বিশদ তথ্য বিজ্ঞানীদের জানা ছিলো না। যাই হোক, চার্লস ক্রস তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ জোগাড় করতে পারেননি। ১৮৯৯ সালে নিকোলা টেস্‌লা মহাকাশে বেতার তরঙ্গ ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেন। এক প্রকাণ্ড তারের কয়েল তৈরি করে টেস্‌লা কাজে নেমে পড়েন। কিন্তু বহু পরিশ্রম করেও তাঁর পরীক্ষা সফল হয়নি। ১৯২২ সালে ইটালির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মার্চিজ মার্কনি একটি প্রকাণ্ড অ্যানটেনা তৈরি করে নৌকোয় চাপিয়ে ভাসিয়ে দেন সমুদ্রে, কিন্তু তাতেও উল্লেখযোগ্য কোনও ফল পাওয়া যায়নি।

১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে ভিন্‌গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী অনুসন্ধানের দৃশ্যপটে এসে হাজির হলেন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক। এতোদিন ধরে যা ছিলো নেহাতই এলোমেলো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ড্রেক তাকে সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর রূপ দিলেন। শুরু হলো বুদ্ধিমান প্রাণী অনুসন্ধানের নতুন যুগ। জন্ম নিলো, 'সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স' বা 'সেটি' প্রোগ্রাম।

মহাকাশ থেকে বহু বেতার-তরঙ্গ এসে পৌঁছয় পৃথিবীতে। ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক-এর বিশ্বাস, ভিন্‌গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। এই

বিশ্বাস থেকেই ১৯৬০ সালে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্রেক শুরু করেছিলেন 'প্রজেক্ট ওজ্‌মা'। ১৯৭৪-এ নাটকীয়ভাবে তিনি বিভিন্ন নক্ষত্র অভিমুখী বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ করার কাজও শুরু করলেন। তিনি বললেন, মহাবিশ্বে আমরা একা নই। দূরে, বহু দূরে, কেউ না কেউ গ্রহণ করবে আমাদের এই সংকেত। তারপর তারা উত্তর পাঠাবে। জানাবে, আমাদের সংকেতের উত্তর।

১৯৬০ সালের প্রথম পরীক্ষায় ড্রেক-এর লক্ষ্য ছিলো ছুটি নক্ষত্র: এপসিলন এরিডানি ও টাউ সেটি। পৃথিবী থেকে এই নক্ষত্র ছুটির দূরত্ব যথাক্রমে সাড়ে দশ ও বারো আলোকবর্ষ, এবং এদের চরিত্র অনেকটা সূর্যের মতো। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি অথচ সূর্যের মতো নক্ষত্র বলতে এই ছুটিই। সেই কারণেই ড্রেক এদের বেছে নিয়েছিলেন পরীক্ষার জন্য। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাঙ্ক মান-মন্দিরের ২৬ মিটার ব্যাসের রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করে তিনি প্রথম অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। তাতে ছু-একটা সন্দেহজনক সংকেত যে পাননি তা নয়। তবে প্রথমে চমকে উঠলেও পরে জানা গেছে ওগুলো পৃথিবীরই কোনও উড়োজাহাজের সংকেত। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছিলো ড্রেক-এর। এইভাবে ১৫০ ঘণ্টার অনুসন্ধানের কাজ চালিয়েও ড্রেক ব্যর্থ হন। কিন্তু তাই বলে তিনি নিরাশ হননি।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক প্রথম 'সেটি' সম্মেলনের আয়োজন করলেন পরের বছরেই। সম্মেলনের প্রয়োজনে তিনি লিখে ফেলেছিলেন একটি সহজ সমীকরণ। সেই সমীকরণ এখন 'ড্রেক সমীকরণ' নামে পৃথিবী বিখ্যাত। আইনস্টাইন-এর $E=mc^2$ সমীকরণটির মতোই বর্তমানে 'ড্রেক সমীকরণের' খ্যাতি। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের পাতায় এই সমীকরণ এখন শোভা পায়। রুশ জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার পত্রিকাতেও এর পাকাপাকিভাবে স্থান হয়েছে। সম্ভাবনা ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে যে সমীকরণ ড্রেক গঠন করেছেন তা থেকে জানা যায়মহাবিশ্বের কতোগুলি গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশ সম্ভব। যেমন আমাদের মিল্কি ওয়ে নীহারিকায় আনুমানিক

১০ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। তাদের কারও কারও সূর্যের মতো গ্রহজগৎ রয়েছে। ড্রেক সমীকরণ থেকে হিসেব পাওয়া যায়, মিল্কি ওয়ে-র অন্তত ১২ লক্ষ গ্রহে প্রাণের বিকাশ সম্ভব।

বার বার ব্যর্থ হলেও ড্রেক গত দু' যুগ ধরেই তাঁর অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে গেছেন। বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজ করাটা তাঁর চোখে অনেকটা 'খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো'। দীর্ঘ দিনের অনুসন্ধান কেন ব্যর্থ হলো সে বিষয়ে ড্রেক বলেছেন, 'আমরা যেভাবে খোঁজ করেছি সেটা অনেকটা খড়ের গাদার পাশ দিয়ে বারকয়েক হেঁটে যাওয়ার মতো। তার বেশি কিছু নয়। কারণ মহাবিশ্বের গ্রহের সংখ্যা এতোই বেশি, আর আমাদের খোঁজার ক্ষমতা এতোই সীমিত।'

গত দশকে ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক অ্যারিসিবো মানমন্দিরের দায়িত্বে ছিলেন। সেখানে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রণযোগ্য রেডিও-টেলিস্কোপ। টেলিস্কোপটির ব্যাস প্রায় ৩০০ মিটার। এই টেলিস্কোপ ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্র দিয়ে বেতার-তরঙ্গেরও খোঁজের সঙ্গে সঙ্গে বেতার-সংকেত প্রেরণের কাজও চালিয়ে গেছেন ড্রেক। এ পর্যন্ত পরীক্ষা নিষ্ফল হলেও তিনি ফলের আশা একেবারে ছেড়ে দেননি।

ভিন্‌গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর অনুসন্ধান নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। ইউফো গবেষণার মতোই এই গবেষণাকে অনেকে 'ভস্মে ঘি ঢালা' বলে অভিযুক্ত করেছেন। তাতে 'সেটি' প্রকল্পের সমর্থক বিজ্ঞানীরা মানুষের দরবারে একটি আন্তর্জাতিক আবেদনপত্র পেশ করেছেন। আবেদনপত্রটি লিখেছেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সাগান এবং তাতে স্বাক্ষর করেছেন চোদ্দটি দেশের বাহাত্তর জন বিজ্ঞানী। তার মধ্যে সাতজন হলেন নোবেল-বিজয়ী। আবেদনপত্রে কার্ল সাগান লিখেছেন, এক কিংবা দু' দশক ধরে সুপরিকল্পিত এই অনুসন্ধানের কাজে খরচ হবে বছরে মাত্র কয়েক মিলিয়ন ডলার।

সন্দেহ নেই, খরচ খুবই কম। কারণ এ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত

দেশ 'সেটি' প্রকল্পের পেছনে মোট যতো টাকা খরচ করেছে তা একটি এ-এইচ ফোর অ্যাটাক হেলিকপ্টারের দামের চেয়েও কম। তাছাড়া, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও রেডিও-টেলিস্কোপ নিয়ে আগামী দশ বিশ-বছর ধরে যদি বড়সড় অনুসন্ধানের কাজও চালানো যায়, তাহলে সেই খরচের পরিমাণ হবে একটি বি-ওয়ান বম্বারের দামের তিন ভাগের এক ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সামরিক খাতে উন্নত দেশগুলি যা খরচ করে তার নগণ্য একটি অংশ 'সেটি' প্রকল্পের পেছনে খরচ করলেই যথেষ্ট। এ পর্যন্ত এই প্রকল্পে অংশ নিয়েছে সাতটি দেশ, আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি ও নেদারল্যাণ্ডস্। সম্প্রতি জাপানও যোগ দিয়েছে এই অনুসন্ধানে।

গত পঁচিশ বছর ধরে পৃথিবীর সুবৃহৎ রেডিও-টেলিস্কোপ নিয়ে সাতটি দেশের বিজ্ঞানীরা মোট ১,৩০,০০০ ঘণ্টা অনুসন্ধানের কাজ চালিয়েছেন, কিন্তু ফল মেলেনি। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সঙ্ঘের 'সেটি' কমিশনের সভাপতি মাইকেল পাপাগিয়ানিস বলেছেন, আমরা হতাশ হলেও হাল ছাড়িনি। আমাদের অনুসন্ধান চলবে। লেসার-সংকেত, অবলোহিত-সংকেত, সবরকম সংকেতের জন্যই খোঁজ করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

সম্প্রতি 'সেটি' প্রকল্পে যোগ দিয়েছে প্রখ্যাত সংস্থা 'নাসা'। সাড়ে বিরাশি লক্ষ চ্যানেলে বেতার-সংকেত অনুসন্ধানের কাজ চালাবে 'নাসা'। তারা কাজে লাগাবে আধুনিক প্রযুক্তি, রোবট, ও সুপার কম্পিউটার। আর ব্যব্যহার করবে, গভীর মহাকাশে অনুসন্ধানের কাজে উপযুক্ত 'নাসা'-র তিনটি বিশাল টেলিস্কোপ ও ১০০ মিটার ব্যাসের একটি অ্যানটেনা।

গত ১৯৭৪ সালে 'সেটি'র জনক ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক মহাকাশে একটি মহাজাগতিক 'টেলিগ্রাম' পাঠিয়েছেন। মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ এম-থার্টিন লক্ষ্য করে এই অভিনব মহাজাগতিক সংকেত পাঠিয়েছেন

ড্রেক। এম-থার্টিন-এ মোট প্রায় ১০ লক্ষ নক্ষত্র রয়েছে। আজ থেকে প্রায় ২৫ হাজার বছর পরে এই সংকেত সেখানে পৌঁছবে। যদি সেখানকার কোনও গ্রহে কোনও বুদ্ধিমান সভ্যতা থেকে থাকে, তাহলে ড্রেক-এর সংকেতের পাঠোদ্ধার করে তারা জানতে পারবে পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণীদের কথা। জানবে, মহাবিশ্বে তারা একা নয়। ড্রেক-এর সংকেত এখন পৃথিবী থেকে ১২ আলোকবর্ষ দূরে পৌঁছে গেছে।

'সেটি' প্রকল্পের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন করলে মাইকেল পাপাগিয়ানিস বলেন, 'যদি আমরা ভিন্‌গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান পাই তাহলে সেটা হবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। আর যদি জানা যায় প্রকাণ্ড মহাবিশ্বে আমরা একা, তাহলে সেটাও আমাদের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হবে। কারণ তখনই আমরা বুঝতে পারবো আমাদের প্রকৃত মূল্য। উপলব্ধি করতে পারবো মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখা কতো জরুরী!'

এক-দু দশক আগেও কল্পবিজ্ঞানের গল্প-উপন্যাসে আমরা সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহে-উপগ্রহে কিম্ভূতকিমাকার নানারকম প্রাণীর কথা পড়েছি। যেমন চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদি গ্রহ ছিলো ভিনগ্রহীদের বসবাসের প্রিয় জায়গা। কিন্তু বিজ্ঞান যতো সাবালক হয়েছে ততোই এই কল্পনার পথে বাধা তৈরি হয়েছে। যেমন, এখন এ-কথা সকলেরই জানা, সৌরজগতের একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ। সুতরাং আমাদের কল্পনা এখন মহাবিশ্বের অন্যান্য গ্রহকে ঘিরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে হয় সেই কল্পনা একদিন বাস্তব রূপ নেবে, অথবা চিরতরে মুছে ফেলতে হবে সেই অনুমান।

ফ্র্যাঙ্ক ড্রেকের মতো বহু বিজ্ঞানীই এখন মহাবিশ্বের আনাচে-কানাচে সমস্বরে ছুঁড়ে দিচ্ছেন একই প্রশ্ন: 'কেউ আছেন? আমরা ছাড়া মহাবিশ্বে আর কেউ আছেন? থাকলে সাড়া দিন…।'

—

এক-দুই কেমন করে গুনতে হয় সেটা আমরা সবাই জানি। যে কোনও ছোট ছেলেও এক থেকে একশো, চাই কি হাজার পর্যন্তও গুনে ফেলতে পারে অনায়াসে। এই সংখ্যা গোনার ব্যাপারে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি দুটো জিনিস। প্রথম হলো, গলার স্বর, যা সংখ্যাগুলো শব্দ করে উচ্চারণ করে। আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হলো দু-হাতের দশ আঙুল। ছোটবেলায় অঙ্ক শেখার শুরুতে আমরা আঙুলে কর গুনে ধাপে ধাপে এগোই। গুনতে গুনতে যখন দু-হাতের দশটা আঙুলই খরচ হয়ে যায়, তখন আবার ফিরে আসি প্রথম আঙুলে। শুরু হয় প্রথম গণনার পুনরাবৃত্তি। সুতরাং, অনায়াসে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মানুষের হাতের আঙুলই হলো সবচেয়ে প্রাচীন প্রাকৃতিক কম্পিউটার বা যন্ত্রগণক।

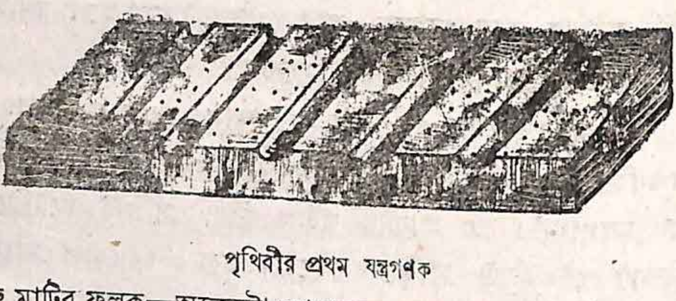
হাতের আঙুলের সংখ্যা ১০ হওয়ার ফলেই হয়তো ১থেকে ৯ এবং ০, এই দশটি সংখ্যার চলন হয়েছিলো আমাদের ভারতবর্ষে। তারপর থেকে এই সংখ্যা-পদ্ধতি সারা পৃথিবীর মানুষ আজও ব্যবহার করে চলেছে—যার পোশাকী নাম হলো দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বা ডেসিম্যাল নাম্বার সিস্টেম।

যদি এমন হতো যে ৫-এর বেশি আর কোনও সংখ্যা নেই, তাহলে কোনও জিনিসের সংখ্যা ৫ পেরিয়ে গেলেই বলতে হতো 'অনেক' অথবা 'অসংখ্য'। এ জাতীয় ঘটনা কিন্তু সত্যিই ঘটেছিলো আফ্রিকার হটেনটট্ উপজাতিদের ক্ষেত্রে। ওরা ৩-এর বেশি মোটেই গুনতে পারতো না। সবচেয়ে আধুনিক যে কম্পিউটার মানুষের হাতে রয়েছে সেও কিন্তু মাত্র দুটো সংখ্যাই চেনে— ০ ও ১। তবে আধুনিক কম্পিউটার 'বুদ্ধিমান' হওয়ার ফলে শুধু ০ ও ১ দিয়েই সবরকম সংখ্যা তৈরি করে নিতে পারে নিজের প্রয়োজন মতো। এই সংখ্যা-পদ্ধতির নাম হলো 'দ্বিকোটিক' বা 'বাইনারি' সংখ্যা-পদ্ধতি।

দশ পর্যন্ত গুনতে শিখে মানুষের কোনও অসুবিধে হয়নি। দিব্যি হাতের আঙুলেই তার কাজ চলে যাচ্ছিলো। এমন সময়, হঠাৎই কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মাথায় একটা উদ্ভাবনী বুদ্ধি খেলে গেলো : আঙুলের বদলে ছোট ছোট নুড়ি ব্যবহার করলে কেমন হয়! এখানে উল্লেখযোগ্য, এই উদ্ভাবনী বুদ্ধির ঝলক আসতে সময় লেগেছিলো মোটামুটিভাবে কয়েক লক্ষ বছর।

এরপর থেকে দশটা নুড়ি বা অন্য কোনও ঐ জাতীয় বস্তু একটা কৌটোয় ভরে মানুষ সব সময় রাখতে লাগলো তার হাতের কাছে। প্রয়োজনে সেগুলো তাদের গণনায় সাহায্য করতে লাগলো। কিন্তু নুড়ি রাখার কৌটোটাকে ঠিক কোন্ চেহারা দিলে হিসেব-নিকেশের ব্যাপারটা আরও সহজ ও দ্রুত হবে, সেটা ভেবে বার করতে প্রস্তর যুগের পণ্ডিতদের বহু শতাব্দী লেগে গিয়েছিলো।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে টাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস উপত্যকায় যে সভ্যতা জেগে উঠেছিলো সেখানকার বুদ্ধিমান মানুষ আবিষ্কার করলো পৃথিবীর প্রথম যন্ত্রগণক বা ক্যালকুলেটার—যা সম্পূর্ণভাবেই মানুষের তৈরি। এই ক্যালকুলেটার আসলে একটি



পৃথিবীর প্রথম যন্ত্রগণক

পুরু মাটির ফলক—অনেকটা আমাদের চেনা কালো শ্লেটের মতো। এই ফলকের ওপরে তারা সামান্তরাল কয়েকটি খাঁজ কেটে নিলো। তারপর সেই খাঁজের ওপরে বসিয়ে দিলো অঙ্ক কষার নুড়িগুলো। হিসেবের সময় নুড়িগুলো খাঁজের গর্ত বরাবর এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চালিয়ে উত্তর বার করা হতো।

এই যন্ত্রগণকের একটা ছোট্ট সুবিধে প্রাচীন পুরুষদের মুগ্ধ করে-

ছিলো। সেটা হলো, গণনার কাজে আর আগের মতো দুটো হাত ব্যবহারের দরকার হয় না, একটা হাতেই কাজ সারা হয়ে যায়। এই সুবিধেটুকুর এতো গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আজ হয়তো আমাদের অবাক করতে পারে, কিন্তু সেই প্রাচীনকালে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিলো অত্যন্ত স্বাভাবিক।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মিশরের মানুষ এই যন্ত্রগণকের ব্যবহার শিখলো। অবশ্য তার প্রায় দেড়শো বছর আগেই চীনদেশ, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এর ব্যবহারের কথা জানা গেছে। বিশেষ করে গ্রীকরা এই যন্ত্রকে কলকব্জা দিয়ে বেশ উন্নত করে তুলেছিলো। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯০১ সালে।

গ্রীস দেশের একটি দ্বীপের নাম অ্যান্টিকিথেরা। কোনও এক সময়ে তারই কাছাকাছি ডুবে গিয়েছিলো একটা জাহাজ। ১৯০১ সালে উদ্ধার করা হলো জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ। সেখান থেকে পাওয়া গেলো কলকব্জা দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্রগণক। পরীক্ষায় জানা গেলো, যন্ত্রটি আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৮২ সালে তৈরি। ছোট-বড় নানান চাকতি জুড়ে যন্ত্রটিকে বেশ 'জটিল' কম্পিউটারই বলা যায়। পরে জানা গেছে, ঐ চাকতিগুলো সূর্য, চন্দ্র, বিভিন্ন গ্রহ ও কিছু কিছু নক্ষত্রের গতিবিধি নির্দেশ করে।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিদিসের সময়ে, এক ধরনের 'কম্পিউটার' চালু ছিলো। তাকে বলা হতো 'অ্যাবাকাস'। যন্ত্রটির গঠন খুব সহজ-সরল। একটি কাঠের ট্রে-র ওপরে কিছুটা কালচে বালির স্তর ছড়ানো। সেই বালিতে আঙুল অথবা ছুঁচলো কিছু দিয়ে দাগ টেনে অঙ্ক কষা হয়। অনেকটা আমাদের শ্লেট-পেন্সিলের মতো। গ্রীস ও রোমের যুদ্ধ চলাকালীন এক রোমান সৈন্যের হাতে নিহত হন আর্কিমিদিস। মৃত্যুর মুহূর্তে ঠিক এইরকমই একটা বালির 'শ্লেট'-এ জ্যামিতি চর্চা করছিলেন তিনি। তাঁর শেষ কথা ছিলো, 'বালিতে আঁকা বৃত্তগুলো নষ্ট কোরো না!'

উপরোক্ত বালির শ্লেট-এর নাম 'অ্যাবাকাস' হওয়ার পিছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, গ্রীক ভাষায় 'অ্যাবাক্স' শব্দের অর্থ চ্যাপ্টা কাঠের বোর্ড বা পায়াহীন টেবিল। আর দ্বিতীয়ত, হিব্রু ভাষায় 'অ্যাবাক' বলা হতো ধুলোকে—অর্থাৎ 'অ্যাবাকাস'-এর ক্ষেত্রে কালচে বালিকে।

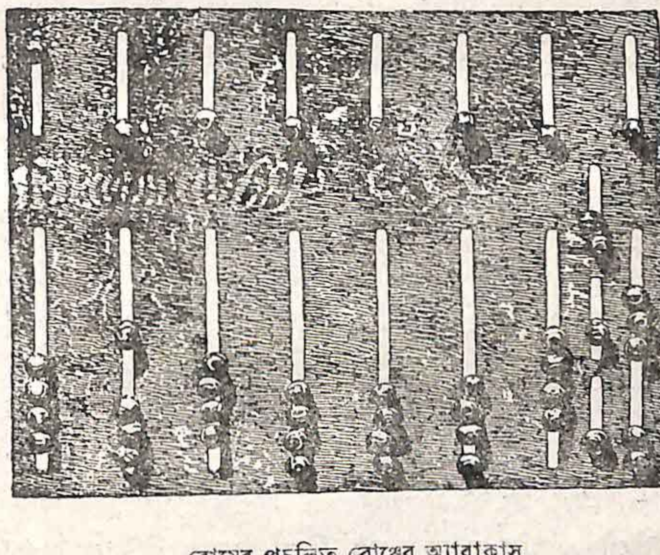
কয়েক হাজার বছরের মধ্যে 'মাটির শ্লেট'-এ নুড়ি সরিয়ে হিসেব করার যন্ত্র সামান্য রূপবদল করে ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর নানান জায়গায়। তারই একটা রূপ 'গণনা-ফলক'। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই 'অ্যাবাকাস'টির চলন ছিলো। এর গঠনে সমান্তরাল খাঁজের বদলে ছিলো কয়েকটি সমান্তরাল রেখা। এক একটি রেখা একক, দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদি মান নির্দেশ করতো। কখনও এই দাগ কাটা হতো কাঠের ফলকে, কখনও বা আঁকা হতো পার্চমেণ্ট কাগজে, কখনও পাথরে খোদাই করা হতো, আবার কাপড়ের ওপরে সেলাই করেও আঁকা হতো। এই যন্ত্রগণককে গ্রীকরা বলতো 'অ্যাবাকিয়ন', রোমানরা বলতো 'অ্যাবাকাস'। গণকের সমান্তরাল রেখাগুলোর ওপরে নুড়ি বসিয়ে বিভিন্ন সংখ্যা নির্দেশ করা হতো, এবং তার ভিত্তিতেই সম্পন্ন হতো হিসেব-নিকেশ। নুড়িকে ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় 'ক্যালকুলাস' ; এর থেকেই হয়তো ইংরেজী 'ক্যালকুলেট' বা 'অঙ্ক-কষা' শব্দটির উৎপত্তি।

এ জাতীয় গণনা-ফলকের ছবি অনেক পাওয়া গেলেও একটি মাত্র গ্রীক গণনা-ফলক মানুষ হাতে পেয়েছে। ১·৯ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৭৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি আয়তাকার পাথরের ফলক পাওয়া গেছে সালামিস দ্বীপে।

সাধারণত 'অ্যাবাকাস' বলতে যে যন্ত্রগণটিককে বোঝানো হয় সেটা উপরোক্ত গণকেরই সামান্য উন্নত রূপ। 'অ্যাবাকাস'-এ সমান্তরাল রেখাগুলো পরিণত হয়েছে সমান্তরাল সরু তার অথবা রডে। এবং নুড়িগুলোকে পুঁতির রূপ দিয়ে মালার মতো গেঁথে দেওয়া হয়েছে সমান্তরাল তারগুলোয়।

ছোটবেলায় ধরনের এক শ্লেট আমরা অনেকেই ব্যবহার করেছি, যার একপাশে থাকতো কয়েকটা সমান্তরাল তার। সেই তারে মালার মতো পরানো থাকতো ছোট ছোট রঙিন পুঁতি—যা দিয়ে এক-দুই গুনতে শেখানো হতো। শ্লেটের অংশটুকু বাদ দিয়ে শুধু পুঁতির অংশটুকু রাখলে 'অ্যাবাকাস'-এর চেহারার অনেকটা আঁচ পাওয়া যায়।

রোমানদের মধ্যে একাধিক ধরনের অ্যাবাকাসের চলন ছিলো। তার মধ্যে সবচেয়ে অবাক করে দেয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত ব্রোঞ্জের অ্যাবাকাসটি। কারণ তার সঙ্গে আধুনিক জাপানী অ্যাবাকাসের কাঠামো আশ্চর্যরকম ভাবে মিলে যায়। এই অ্যাবাকাসটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে।



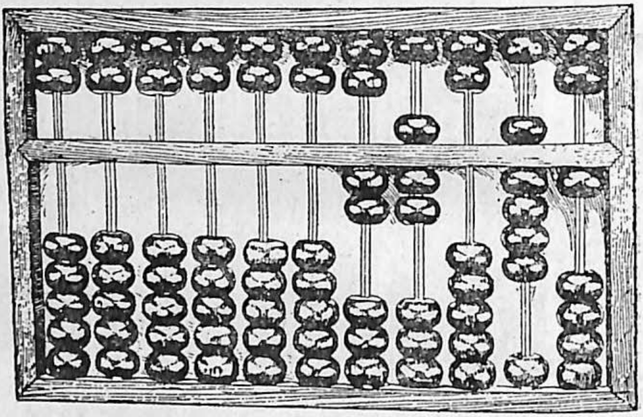
রোমের প্রচলিত ব্রোঞ্জের অ্যাবাকাস

ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ সম্ভবত চীনদেশ থেকেই অ্যাবাকাসের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে জাপানে। তবে জাপানীরা এর নাম দিয়েছিলো 'সোরোবান', যেমন রুশরা নাম দিয়েছিলো 'স্কোটি'। তবে চীনারা একে বলতো 'সুয়ান পান'।

আধুনিকতার ঢেউ ক্রমশ ইওরোপে ও ইংল্যাণ্ডে আগ্রাসী বিস্তার

ঘটালে অ্যাবাকাসের চলন ক্রমে সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হতে থাকে। বরং প্রাচ্যের দেশগুলোতে এর প্রাধান্য মোটামুটিভাবে অক্ষত থেকেছে।

যন্ত্রগণক 'সুয়ান পান' শুধু চীনদেশে নয়, কোরিয়াতেও ব্যবহার করা হয়। কোনও কোনও চীনে রেস্তরাঁ অথবা লণ্ড্রীতে আজও আমাদের চোখে পড়ে চীনে দোকানদার দ্রুত অভ্যস্ত হাতে 'সুয়ান পান' নিয়ে অঙ্কের হিসেব কষে চলেছে। এই যন্ত্রের 'পুঁতি'গুলো দেখতে অনেকটা ক্যারাম খেলার ঘুঁটির মতো, শুধু ধারগুলো ঘষে মসৃণ করে দেওয়া। কাঠের 'পুঁতি'গুলো চলাফেরা করে বাঁশের কাঠির মধ্যে—যে ধরনের কাঠি দিয়ে চীনারা খেয়ে থাকে। গোটা



চীনা অ্যাবাকাস 'সুয়ান পান'-এ ২৭০৯১ সংখ্যাটি দেখানো হয়েছে

কম্পিউটারটা একটা কাঠের দণ্ড দিয়ে আড়আড়িভাবে দু-ভাগে ভাগ করা। প্রতি কাঠিতে ওপরের ভাগে দুটো, আর নিচের ভাগে পাঁচটা করে 'পুঁতি' থাকে। ওপরের ভাগের প্রত্যেকটা 'পুঁতি'র মান ৫, এবং কোনও 'পুঁতি'কে নামিয়ে কাঠের দণ্ডের কাছে নিয়ে এলে ৫ সংখ্যাটি বোঝায়। আবার নীচের ভাগের প্রতি ঘুঁটি বা 'পুঁতি'র মান মাত্র ১। এর কোনও একটা ঘুঁটি ওপরে কাঠের দণ্ডের

কাছে সরিয়ে দেওয়ার অর্থ ১ সংখ্যাটি নির্দেশ করা। দুটি ঘুঁটি সরালে ২।

'সুয়ান পান'-এ মোট এগারোটি বাঁশের কাঠি থাকে। এক একটি কাঠি ডানদিক থেকে শুরু করে যথাক্রমে একক, দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদির ঘর নির্দেশ করে। সবচেয়ে বড় যে সংখ্যা 'সুয়ান পান'-এ প্রকাশ করা সম্ভব সেটি হলো ৯৯,৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯ বা ন'হাজার ন'শো নিরানব্বই কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার ন'শো নিরানব্বই! এই সংখ্যাটি প্রকাশ করতে গেলে এগারোটি বাঁশের কাঠির প্রত্যেকটিতেই ৯ সংখ্যাটি নির্দেশ করতে হবে। কতো বড় বড় সংখ্যা নিয়ে যে 'সুয়ান পান'-এ হিসেব করা সম্ভব তা এই উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

চীনা ভাষায় 'সুয়ান' শব্দটির অর্থ 'ক্যালকুলেট' বা 'অঙ্ক-কষা'। এই শব্দটির চীনা প্রতীকে দেখা যায়, দুটো হাতের প্রতীক একটি 'অ্যাবাকাস' ধরে রয়েছে, এবং অ্যাবাকাসের ওপর নির্দেশিত রয়েছে বাঁশের প্রতীক।



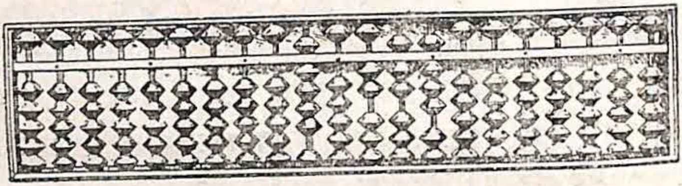
'সুয়ান' শব্দটির চীনা প্রতীক

জাপানী 'সোরোবান'-এর ঘুঁটিগুলো 'সুয়ান পান'-এর চেয়ে সামান্য ভিন্ন চেহারার। হাতলবিহীন দুটো চায়ের কাপ মুখোমুখি এঁটে দিলে 'সোরোবান'-এর ঘুঁটির আকৃতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া মোট দুটি বিষয়ে 'সুয়ান পান'-এর সঙ্গে 'সোরোবান'-এর তফাৎ রয়েছে। প্রথম তফাৎ, এখানে লম্বালম্বি বাঁশের কাঠির সংখ্যা এগারোর বদলে একুশটি। আর দ্বিতীয় তফাৎ, অ্যাবাকাসের ওপরের অংশে ঘুঁটির সংখ্যা দুটির বদলে মাত্র একটি, এবং নীচের

অংশে পাঁচটির জায়গায় চারটি।

একুশটি বাঁশের কাঠি থাকায় সবচেয়ে বড় যে সংখ্যাটি 'সোরোবান'-এ প্রকাশ করা যায় সেটি হলো একুশটি ৯ পাশাপাশি লিখে তৈরি হওয়া একটি সুবিশাল সংখ্যা।

এই অ্যাবাকাসটিও 'সুয়ান পান'-এর মতো একটি কাঠের দণ্ড দিয়ে দুভাগে ভাগ করা। জাপানীরা ওপরের ভাগকে বলে 'স্বর্গ' ও নিচের ভাগকে বলে 'মর্ত'। অনেক আগে 'মর্তে' প্রতিটি কাঠিতে মোট পাঁচটি করেই ঘুঁটি ছিলো, কিন্তু ১৯২০ সাল নাগাদ অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হওয়ায় পাঁচ নম্বর ঘুঁটিকে নির্বাসন দেওয়া হয়।



জাপানী অ্যাবাকাস 'সোরোবান'

অধুনা জাপানে 'সোরোবান'-এর ব্যবহার যথেষ্ট প্রচলিত। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক কম্পিউটার আধিপত্য বিস্তার করা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যবসায়ীরা ও সাধারণ দোকানদাররা এখনও 'সোরোবান' ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়াও প্রতি বছর জাপানে অ্যাবাকাস দিয়ে অঙ্ক কষার প্রতিযোগিতা হতো—তাতে অসংখ্য মানুষ নামও দিতো।

টেবিল ক্যালকুলেটরের সঙ্গে অ্যাবাকাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনেক ঘটনাই শোনা গেছে। এই প্রতিযোগিতায় কোনও চীনা বা জাপানী 'অ্যাবাসিস্ট', অর্থাৎ, অ্যাবাকাস-পারদর্শী ব্যক্তিকে মুখোমুখি হতে হয়েছে মার্কিনী কম্পিউটার অপারেটরের সঙ্গে। সবচেয়ে নামী যে প্রতিযোগিতা হয়েছিলো, সেটা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে টোকিওতে। দক্ষতার লড়াইয়ে মুখোমুখি হলেন টমাস উড ও

কিয়োশি মাৎসুজাকি। প্রায় সমস্ত রকমের অঙ্কেই মাৎসুজাকি তার অ্যাবাকাস দিয়ে হারিয়ে দিয়েছিলেন টমাস উডকে। একমাত্র বিশাল বিশাল সংখ্যার গুণফল বের করার সময় উডের কম্পিউটার মাৎসুজাকির অ্যাবাকাসের চেয়ে এগিয়ে ছিলো।

অ্যাবাকাসে অঙ্ক কষার গতি এতো দ্রুত হওয়ার একটিই মাত্র কারণ: এতে অঙ্কের বেশিরভাগ হিসেব-নিকেশই হয়ে থাকে 'অ্যাবাসিস্ট'-এর মগজে। শুধু অঙ্কের কয়েকটি মাত্র ধাপ সে নথিবদ্ধ করে রাখে হাতের প্রাচীন কম্পিউটার, অ্যাবাকাসে। তবে অ্যাবাকাসে হিসেব কষার একমাত্র অসুবিধে হলো অঙ্কের মধ্যবর্তী সমস্ত ধাপগুলো যন্ত্রে ধরে রাখা যায় না। ফলে অঙ্ক কষতে গিয়ে কোনও একটি ধাপে ভুল হয়ে গেলেই বিপদ—সঠিক উত্তর ধরা দেবে না কিছুতেই। এই সমস্যার এক অদ্ভুত মজাদার সমাধানের পথ বের করে ফেলেছেন জাপানী ব্যবসায়ীরা। তাঁরা একই অঙ্ক কষতে দেন তিনজন 'অ্যাবাসিস্ট'-কে—এবং একই সঙ্গে। যদি তিনটে উত্তর ঠিক ঠিক মিলে যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় উত্তর নির্ভুল। অনেকটা যেন 'তিন সত্যি'-র মতো।

আরব, পারস্য ইত্যাদি ইসলামী দেশগুলি থেকে অ্যাবাকাসের প্রচলন ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকে উত্তর অঞ্চলে, এবং তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিককালে প্রচলিত হয় রুশ দেশে। মধ্যপ্রাচ্যে এখনও অ্যাবাকাস ব্যবহার করা হয়। তুর্কিরা একে বলে 'কুল্‌বা', এবং আর্মেনীয়রা বলে 'ছোরেব্‌'। রাশিয়ার অ্যাবকাস 'স্কোটি'-র সঙ্গে 'কুল্‌বা' কিংবা 'ছোরেব্‌'-এর যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

বর্তমান রাশিয়ায় 'স্কোটি' ব্যবহারের ছবিটা মূলত জাপানেরই মতো। স্কুলে, ব্যাঙ্কে, দোকানে এই যন্ত্রগণকটি রীতিমতো অপরিহার্য। অবশ্য আধুনিক টেবিল-ক্যালকুলেটর সীমিতভাবে হলেও নিজের জায়গা করে নিয়েছে সেখানে। রুশরা কখনও কখনও 'স্কোটি'কে 'চাইনিজ অ্যাবাকাস' নামে উল্লেখ করে থাকে। হয়তো এই সূত্রেই অনেকে দাবি করে থাকেন, রাশিয়ান যন্ত্রগণকটির উৎপত্তিস্থল

চীনদেশ, যা কালক্রমে সাইবেরিয়ার পথ ধরে রাশিয়াতে এসেছে। কিন্তু চীন বা জাপানের তুলনায় ইসলামী দেশগুলির সঙ্গেই রাশিয়ান 'স্কোটি'-র গঠনগত মিল বেশি খুঁজে পাওয়া যায়।

'স্কোটি'তে অনুভূমিকভাবে মোট দশটি সমান্তরাল তার বা রড থাকে। দশটির মধ্যে আটটি রডে থাকে দশটি করে ঘুঁটি, আর বাকি দুটো রডে থাকে চারটি করে। ঘুঁটিগুলোর চেহারা অনেকটা চ্যাপ্টা ডিমের মতো। প্রত্যেক সারির ঠিক মাঝখানের দুটো ঘুঁটির রঙ আলাদা। 'সোরোবান'-এ যেমন আড়াআড়ি একটা কাঠের দণ্ড দিয়ে 'স্বর্গ' ও 'মর্ত' দুটো ভাগ করা থাকে, 'স্কোটি'-তে এই ভাগাভাগির দায়িত্ব নেয় ভিন্ন রঙের ঘুঁটি দুটো। রাশিয়ার টাকা—রুবল ও কোপেক-এর ভগ্নাংশের হিসেবের জন্য 'স্কোটি'র দুটো রডে চারটে করে ঘুঁটি রাখা হয়।

যন্ত্রকগণকের বিবর্তন অনেক এগিয়ে গেলেও অ্যাবাকাস বেশ আশ্চর্যভাবেই তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। নাড়াচাড়ার সুবিধে ও দামে সস্তা হওয়াটাই হয়তো এর অন্যতম প্রধান কারণ। তবে বিবর্তনের পথে এরপর এসেছে ধাতব যন্ত্রাংশ—গীয়ার, পিনিয়ন ইত্যাদি—দিয়ে তৈরি যন্ত্রগণক। এই নতুন ধারায় অগ্রণী ভূমিকা নেন প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ব্লাজ পাস্কাল। ১৬৪২ সালে তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটির নাম ছিলো 'টুথ্‌ড্‌ হুইল্‌স্‌', অর্থাৎ 'দাঁতওয়ালা চাকা', যাকে আমরা গীয়ার বলে জানি। পাস্কালের যন্ত্রে শুধুমাত্র যোগ ও বিয়োগ করা যেতো।

এর পরে, ১৬৭১ সালে পাস্কালের যন্ত্রকে উন্নত করেন জার্মান দার্শনিক ও অঙ্কবিদ গটফ্রিদ উইলহেম লাইপ্‌নিৎস। তিনি নিজের নকশায় তৈরি যন্ত্রগণক আবিষ্কার করেন ১৬৯১ সালে। তাঁর যন্ত্রের নাম ছিলো 'রেকনিং মেশিন'। যোগ-বিয়োগ ছাড়া এ যন্ত্রে গুণও করা যেতো, তবে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য তাঁর যন্ত্র তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

এরপর দৃশ্যপটে এলেন ব্রিটিশ অঙ্কবিদ চার্লস ব্যাবেজ—যাঁকে

বলা হয় আধুনিক কম্পিউটারের 'জনক'। ১৮২২ সাল থেকে শুরু করে তিনি উন্নত ধরনের অটোমেটিক কম্পিউটার তৈরির চেষ্টায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেন। যে দুটি কম্পিউটার তিনি তৈরির পরিকল্পনা করেন তাদের নাম ছিলো 'ডিফারেন্স ইঞ্জিন' ও 'অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন'। তাঁর ধ্যান-ধারণাই বর্তমান যুগের ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের গঠনের চাবিকাঠি।

১৯৪৪ সালে আই. বি. এম. কোম্পানি হার্ভার্ড মার্ক-ওয়ান নামে যে যন্ত্রগণকটি তৈরি করে সেটি তত্ত্বের দিক থেকে ছিলো চার্লস ব্যাবেজের মানসপুত্র। এই কম্পিউটারটি দৈর্ঘ্যে ছিলো ১৬ মিটার ও উচ্চতায় আড়াই মিটার। তেইশ অঙ্কের কোনও সংখ্যাকে তেইশ অঙ্কের আরেকটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে এই যন্ত্রটি সময় নিতো মাত্র সাড়ে চার সেকেণ্ড।

এর পরে ইলেকট্রনিক্স শিল্পের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কম্পিউটার এমন এক ক্ষমতাশালী পর্যায়ে পৌঁছেছে যা 'আধুনিক' শব্দটিকেও হয়তো লজ্জা দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ধারাবাহিকভাবে মনে পড়ে যায় তার পূর্বপুরুষদের কথা। দু-হাতের দশ আঙুল থেকে যার শুরু, অ্যাবাকাস ও ধাতব যন্ত্রগণকের বুড়ি ছুঁয়ে আজ সে অহঙ্কারী ফিফ্‌থ জেনারেশন কম্পিউটার—অর্থাৎ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তার গঠন পদ্ধতির পঞ্চম ধারায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু শুরু যে দুটো হাত থেকে, আজও সে পরাধীন এবং ঋণী সেই দুটো হাতের কাছে। মানুষের দুটো কর্মঠ হাত—যে হাত আধুনিক কম্পিউটারের প্রাগৈতিহাসিক প্রপিতামহ।

অতি সহজেই কম্পিউটারের বিবর্তনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় : আদি পর্ব, মধ্য পর্ব এবং আধুনিক পর্ব। আদি পর্বের সূচনা হয়েছিলো মানবজাতির প্রাগৈতিহাসিক যুগে। 'একজন' কিংবা 'একাধিক' ব্যক্তি, এ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা তৈরি হয়েছিলো সহজাত প্রয়োজনে। এমনকি বন্যপ্রাণী শিকারের সময়ও তাকে 'এক' বা 'একাধিক' বিষয়টির মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। যদিও সংখ্যাতত্ত্বের প্রকৃত গুরুত্ব তার বিন্দুমাত্রও জানা ছিলো না।

ধীরে ধীরে মানুষ হাতের অন্যান্য ব্যবহার শিখলো। শিখলো হাতের দশটি আঙুলের ব্যবহার।

এরপরে মানুষ হাত থেকে এগিয়ে গেলো নুড়ির ব্যবহারে। নুড়ি থেকে শ্লেট বা ফলকে। তাপর দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ধারণায় আরও শক্তিশালী হয়ে সে অ্যাবাকাসের ব্যবহার শুরু করলো। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে অ্যাবাকাসের আবির্ভাব ঘটলেও তার অস্তিত্ব আজও চোখে পড়ে চীন, জাপান, রাশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার কোনও কোনও দেশে। কম্পিউটারের বিবর্তনে অ্যাবাকাসের পরবর্তী যুগকে বলা যেতে পারে 'মধ্য' পর্ব।

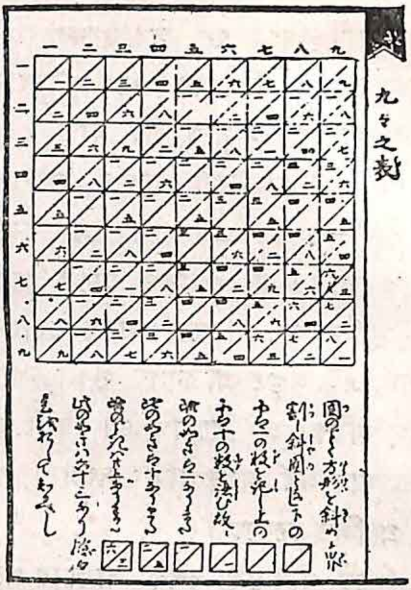
সন্দেহ নেই, শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় মতো কম্পিউটারের আধুনিক পর্ব বা ইলেকট্রনিক-কম্পিউটার-যুগ ঋণী তার এই পূর্বযুগের কাছে। বিভিন্ন ধাতব যন্ত্রাংশ, স্কেল, গীয়ার, পিনিয়ন ইত্যাদি ব্যবহার করে শুরু হয়েছিলো কম্পিউটারের মধ্যযুগের বিপ্লব। কালের ইতিহাসে সময়টা ছিলো সপ্তদশ শতকের শৈশব।

বিপ্লবের সূচনা ঘটিয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অঙ্কবিদ জন নেপিয়ার। তিনি জ্যোতিষচর্চা করতেন, এবং ঘোরতর ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানীয় লোকেরা তাঁকে মায়াবী জাদুকর বলে সন্দেহ করতো, কেউ কেউ বা ভাবতো পাগল। এ-হেন মানুষটি ১৫৯৪ সালে, চুয়াল্লিশ বছর বয়সে, নতুন ভাবে অঙ্ক কষার এক বিচিত্র হদিশ পেলেন। তিনি দেখলেন, ৪ সংখ্যাটিকে প্রকাশ করা যায় $২^{২}$ হিসেবে

(যা মূলত ২ কে দুবার গুণ,), ৮কে লেখা যায় $২^৩$ (২কে তিনবার গুণ), এবং চারকে আট দিয়ে গুণ করে গুণফল যে ৩২ পাওয়া যায় তাকে লেখা যেতে পারে $২^৫$ হিসেবে (২কে পাঁচবার গুণ), অর্থাৎ, ৪কে ৮দিয়ে গুণ না করে যদি ২ সংখ্যাটির ঘাত ২ ও ৩ কে যোগ করা যায়, তাহলেই প্রার্থিত উত্তর পাওয়া যায়। সহজ কথায়, $২^২ \times ২^৩ = ২^{২+৩} = ২^৫ = ৩২$। এইভাবে যে কোনও সংখ্যাকে নিশ্চয়ই ২ সংখ্যার কোনও না কোনও ঘাতে প্রকাশ করা সম্ভব। হয়তো সে ঘাত পূর্ণ সংখ্যা না হয়ে কোনও ভগ্নাংশও হতে পারে। নেপিয়ার দেখলেন, এই অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় গুণ ক্রিয়াটি পরিণত হচ্ছে যোগ-এ, এবং ভাগ পরিণত হয় বিয়োগ-এ। তিনি এর নাম দিলেন 'লগারিদ্‌ম্' পদ্ধতি, যার অর্থ আনুপাতিক সংখ্যা। লগারিদ্‌ম্ পদ্ধতি আজও অঙ্কশাস্ত্রে প্রচলিত রয়েছে।

নতুন চিন্তা নিয়ে দীর্ঘ দুই দশক সাধনার পর জন নেপিয়ার ১৭১৪ সালে তাঁর লগারিদম্ টেব্‌ল্ প্রকাশ করেন। এ-যুগের কম্পিউটার আমাদের জনজীবনে যে গভীর চাঞ্চল্য এনেছে, ঠিক একই ধরনের চাঞ্চলা সৃষ্টি করেছিলো নেপিয়ারের 'লগ-টেব্‌ল্'। এই তালিকার সাহায্যে ভীষণ সুবিধে হয়ে গেলো অঙ্ক কষার। বিশেষ করে বিজ্ঞানীরা যেন অপার স্বস্তি পেলেন। ছক বাঁধা ক্লান্তিকর অঙ্ক কষে তাঁদের আর সুদীর্ঘ সময় খরচ করতে হবে না। নেপিয়ারের তালিকা সামনে রেখে তাঁরা নামতার ছকের মতো সুবিধে পেতে লাগলেন। ইংল্যাণ্ডের আর এক অঙ্কবিদ হেনরী ব্রিগ্‌স্ নেপিয়ারের তালিকার গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধন করেন। বর্তমানে এই দু-ধরনের লগারিদ্‌ম্‌ই প্রচলিত রয়েছে: নেপিয়ারের পদ্ধতিকে সাধারণত বলা হয় 'ন্যাচারাল' লগারিদ্‌ম্, এবং ব্রিগ্‌স্-এর রীতিকে বলা হয় 'কমন্' লগারিদ্‌ম্।

১৬১৭ সালে জন নেপিয়ার বিশেষভাবে দাগ কাটা কতকগুলো স্কেল চালু করেছিলেন। তিনি এগুলোর নাম দেন 'ক্যালেকুলেটিং রড্‌স্'। তাঁর 'র‍্যাব্‌ডোলজিয়া' গ্রন্থে এই রডগুলোর ব্যবহার ব্যাখ্যা



অষ্টাদশ শতকের সূচনায় নেপিয়ার‍্স্ রড্‌স্ চীনে প্রচলিত হয়, এবং পরবর্তী শতকে প্রচলিত হয় জাপানে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হানাই কেন্‌কিচির 'সাইসান্ সোকুচি' বই থেকে গৃহীত ছবিটিতে জাপানে নেপিয়ার‍্স্ রড্‌স্-এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

করেন নেপিয়ার। এই রডগুলো জনসাধারণের মধ্যে 'নেপিয়ার‍্স্ বোন্‌স্' নামে প্রচলিত ছিলো। তাঁর ক্যালকুলেটিং রড্‌স্ বা বোন্‌স্ শুধু যে ইওরোপে জনপ্রিয় হয়েছিলো তা নয়, চীন এবং জাপানও এই যন্ত্রগণকের দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেয়। সামান্য চিন্তা করলেই সিদ্ধান্তে আসা যায়, নেপিয়ারের দণ্ড বা হাড় বয়ে নিয়ে এসেছিলো বর্তমান কালের 'স্লাইড রুল'-এর ইঙ্গিত। ডাক্তারের যেমন স্টেথোস্কোপ, তেমনি ইঞ্জিনীয়ারদের অবিচ্ছেদ্য যন্ত্র ছিলো 'স্লাইড রুল'—কিন্তু এখন ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটরের অধুনা বিপ্লবে 'স্লাইড রুল' অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

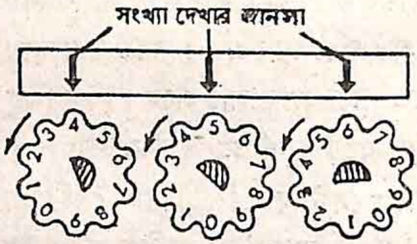
নেপিয়ারের দণ্ডের মধ্যে 'স্লাইড' বা বিসর্পণ এর কোনও ব্যাপার ছিলো না। এই ধর্মটি প্রথম প্রচলন করেন ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী

উইলিয়াম অট্রেড। লগারিদ্‌মিক পদ্ধতিতে ঘর কাটা দুটি স্কেল তৈরি করেন তিনি। তারপর একটিকে অপরটির গা ঘেঁষে চলা-ফেরা করিয়ে লগারিদ্‌ম্‌-এর সাহায্যে চটপট গুণ-ভাগ কষে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। ১৬২২ সালে উদ্ভুত এই যন্ত্রটিকে আমরা বলতে পারি আদি 'স্লাইড রুল'। বিজ্ঞানী অট্রেড এর নাম দিয়েছিলেন 'অ্যাস্ট্রোলেব' —সম্ভবত যন্ত্রটির জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত ব্যবহারের কথা মনে রেখে।

এ-ঘটনার ঠিক এক বছর পরেই জনৈক অধ্যাপক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন। নাম তাঁর উইলিয়াম শিকার্ড—বাইবেলের ভাষা এবং জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী। নানান পরিকল্পনা করে অবশেষে একটি যন্ত্রগণক তৈরি করলেন তিনি। যন্ত্রটি যথাক্রমে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারে সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু কিছু কিছু ব্যবহারিক অসুবিধে থাকায় যন্ত্রটি জনপ্রিয় হয়নি, এবং পরে এক অগ্নিকাণ্ডে যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে গেলে সেটি আর দ্বিতীয়বার তৈরি করা যায়নি।

প্রথম সফল 'মেকানিক্যাল' বা যান্ত্রিক কম্পিউটার তৈরি করতে সমর্থ হন ফরাসী বিজ্ঞানী ব্লাজ পাস্কাল। শৈশব থেকেই অসুস্থতার শিকার হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয়ও একই সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিলো। পাস্কালের পিতার ইচ্ছে ছিলো ছেলেকে প্রাচীন ভাষা শেখাবেন। সুতরাং তাঁকে কোনও ধরনের অঙ্ক বইয়ের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেন নি তিনি। কিন্তু অনিবার্যভাবে পাস্কাল আকৃষ্ট হলেন জ্যামিতির প্রতি। যখন বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, জ্যামিতি হচ্ছে গঠন ও আকার বিষয়ক শাস্ত্র, তখন সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম বত্রিশটি উপপাদ্য ক্রমানুসারে আবিষ্কার করে ফেললেন। পাস্কালের সহোদরা এ-কাহিনী শোনালেও এটি বিশ্বাস হওয়া কঠিন। তবে এ-ঘটনা থেকে পাস্কালের মেধা ও অধ্যাবসায়ের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তিনিই যে ১৬৪২ সালে, মাত্র উনিশ বছর বয়েসে, একটি যান্ত্রিক কম্পিউটার তৈরি করে ফেলেন, এ ঘটনা আমাদের আর বিশেষ অবাক করে না।

পাস্কালের যন্ত্রের প্রধান অংশ কয়েকটি দাঁতওয়ালা চাকা—অনেকটা গীয়ার হুইলের মতো। এই চাকাগুলোর মোট দশটি করে দাঁত, প্রতিটি দাঁতে ০ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো লেখা আছে। মোটর গাড়ির মাইল-মিটারের যে নীতি, অনেকটা সেই নীতিতেই তৈরি হয়েছিলো যন্ত্রটি। এবং তার চেহারা ছিলো আজকের দিনের মেকানিকাল ডেস্ক ক্যালকুলেটরের মতো। কলকাতার একটি নামী পাদুকা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শো-রুমে ব্যবহৃত মেকানিকাল ক্যালকুলেটরে আজও পাস্কালের নীতি সজীবতায় প্রচলিত।



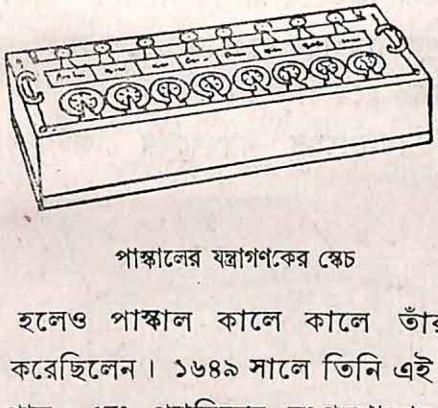
পাস্কালের যন্ত্রের মূল নীতি। তিনটে দাঁতওয়ালা চাকার সাহায্যে ৪৫৬ সংখ্যাটি দেখানো হয়েছে।

ছবিতে যে তিনটি দাঁতওয়ালা চাকা দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ডান দিকেরটি সর্বদা এককের ঘরের সংখ্যা নির্দেশ করে (যেমন, ৬ সংখ্যাটি)। মাঝেরটি দশকের ঘরের সংখ্যা দেখায় (৫ সংখ্যাটি), এবং একেবারে বাঁদিকেরটি নির্দেশ করে শতকের ঘরের সংখ্যা (৪ সংখ্যাটি)। এখন মনে করা যাক, ছবিতে দেখানো ৪৫৬ সংখ্যাটির সঙ্গে আমরা ২১৩ যোগ করতে চাই। তাহলে আমাদের একক-দশক-শতকের ঘরের সংখ্যাগুলোকে পরস্পর যোগ করতে হবে। অর্থাৎ, ৪ এর সঙ্গে ২, ৫ এর সঙ্গে ১, এবং ৬ এর সঙ্গে ৩। পাস্কালের যন্ত্রে যোগ করার নিয়ম হলো, যে সংখ্যাটি যোগ করতে হবে, দাঁত-ওয়ালা চাকাটিকে তীর চিহ্নিত দিকে ঠিক ততগুলো দাঁত ঘুরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, বাঁদিকের চাকাটিকে ছবির অবস্থা থেকে তীর চিহ্নিত দিকে ২ সংখ্যক দাঁত ঘোরাতে হবে, মাঝের চাকাটি ঘুরবে

১ দাঁত, এবং শেষেরটি ৩ দাঁত তাহলেই দেখা যাবে, সংখ্যা দেখার জানালায় যথাক্রমে ৬, ৬ ও ৯ সংখ্যাগুলো, বা ৬৬৯ সংখ্যাটি, দেখা যাচ্ছে—যা হলো ৪৫৬ ও ২১৩-র যোগফল।

বিয়োগের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করতে হয় পাস্কালের যন্ত্রে। তবে চাকাগুলো ঘোরাতে হয় তীর চিহ্নের বিপরীত দিকে।

পাস্কাল যন্ত্রটি তৈরি করেছিলেন মূলত তাঁর পিতার প্রয়োজনে। তিনি ছিলেন সরকারী আধিকারিক, বিভিন্ন কর নির্ণয়ের জন্য তাঁকে নিয়তই রাজ্যের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে হতো। যন্ত্রটি তৈরির পর পাস্কাল তার পেটেণ্ট নিলেন, এবং একটি মডেল পাঠিয়ে দিলেন 'রয়্যাল প্যাট্রন অফ লার্নিং' সুইডেনের রাণী ক্রিশ্চিয়ানার কাছে। রাজ-অনুমতি সাপেক্ষে পাস্কাল পঞ্চাশটিরও বেশি ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। তাদের নাম দেওয়া হয় 'পাস্কালাইন'। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর যন্ত্রের জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক ব্যবহার, কিন্তু যন্ত্রটির দাম যথেষ্ট বেশী হওয়ায় পাস্কালের স্বপ্ন সফল হয়নি।



পাস্কালের যন্ত্রাগণকের স্কেচ

সফল না হলেও পাস্কাল কালে কালে তাঁর যন্ত্রের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। ১৬৪৯ সালে তিনি এই গবেষণার জন্য রাজ-অনুদান পান, এবং প্যারিসের সংগ্রহশালায় তাঁর যে যন্ত্রটি আজও সংরক্ষিত আছে সেটি কিছুটা উন্নত ধরনের। যন্ত্রটি ছয় অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে গণনা করতে পারে। যন্ত্রটির ভিতরে খোদাই করে লেখা রয়েছে: "এই সাক্ষরই একটি অনুমোদিত যন্ত্রের প্রমাণ চিহ্ন।" ব্লাজ পাস্কাল, আবিষ্কারক। ২০শে মে, ১৬৫২।' শুধুমাত্র

যোগ এবং বিয়োগ, এই দু'রকম গণনা করা যেতো পাস্কালের যন্ত্রগণকে।

১৬৬২ সালে মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ব্লাজ পাস্কাল।

পাস্কাল নিজে হয়তো ভাবেননি যান্ত্রিক কম্পিউটারের গঠন অন্য রকম করে তিনি পৃথিবীর কম্পিউটারের ইতিহাস বদলে দেবেন। অথচ কার্যত তাই ঘটেছিলো। পাস্কালের যন্ত্রগণকের সাহায্যে যে গুণফল বের করা সম্ভব এটা উপলব্ধি করতে বিজ্ঞানীদের বেশি সময় লাগলো না। তাঁরা বললেন, 'বার বার যোগের ফলেই গুণফল পাওয়া যায়। যেমন, ৮×৪ এর অর্থ ৮ সংখ্যাটিকে ৪ বার লিখে যোগ করা, অথবা, ৪ সংখ্যাটিকে ৮ বার লিখে যোগ করা।' এই নীতিকে অনুসরণ করে ১৬৭০ সাল নাগাদ ইংল্যাণ্ডের জনৈক কূটনীতিবিদ এবং আবিষ্কারক স্যার স্যামুয়েল মোরল্যাণ্ড এমন একটি যন্ত্র তৈরি করলেন যা গুণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর যন্ত্র পাস্কালের যন্ত্রের মতোই তেমন নির্ভরযোগ্য ছিলো না। তাছাড়া কারিগরী ত্রুটির জন্য যন্ত্রটি খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হতো—যা বাণিজ্যিক ব্যবহারের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

পাস্কাল ও মোরল্যাণ্ডের যন্ত্রগণকের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুপুঙ্খ



লাইপনিৎস্ এর 'রেকনিং মেশিন'-এর স্কেচ

পর্যবেক্ষণের পর ১৬৭১ সালে, মাত্র পঁচিশ বছর বয়েসে, জার্মান বিজ্ঞানী গটফ্রিদ উইলহেল্ম্ লাইপ্নিৎস একটি যন্ত্রগণক তৈরি

করেন। 'সপ্তদশ শতাব্দীর অ্যারিস্টট্‌ল্‌' নামে অভিহিত এই দার্শনিক তথা অঙ্কবিদের যন্ত্রটি যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ প্রক্রিয়া ছাড়াও বিভিন্ন সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করতে পারতো (যেমন ২৫-এর বর্গমূল ৫, ৮১-র বর্গমূল ৯)। ১৬৯৪ সালে যন্ত্রটির একটি কার্যকরী মডেল তৈরি হলো। লাইপ্‌নিৎস্‌ তার নাম দিলেন 'রেকনিং মেশিন'। যন্ত্রটি প্রদর্শিত হলো লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও যান্ত্রিক ত্রুটি মেশিনটির জনপ্রিয়তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো।

লাইপ্‌নিৎস্‌-এর যন্ত্রেই প্রথম সফলভাবে পৌনঃপুনিক যোগের সাহায্যে গুণফল নির্ণয় করা হয়েছিলো। ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য, কারণ আধুনিকতম ডিজিটাল কম্পিউটারও একই পদ্ধতিতে গুণফল নির্ণয় করে থাকে।

এরপর যন্ত্রগণকের বিবর্তন-পথে শুরু হয় দ্রুত পালাবদল। একের পর এক উন্নত মানের গণক তৈরির প্রচেষ্টা চালান ইতালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক মার্শিজ গিওভানি পোলেনি (১৭০৯ সাল), জার্মানীর লিপজিগ শহরের এক মেকানিক জ্যাকব লিউপোল্ড—মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি একটি যন্ত্র তৈরি করেন (১৭২৭ সাল), এবং গিসেন-এর অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ক্রিস্টিয়ান লুডউইগ গারস্টেন—তিনি স্বআবিষ্কৃত একটি যন্ত্রের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে যান ১৭৩৫ সালে।

প্রথম যে যন্ত্রগণক বাণিজ্যিক সফলতা লাভ করে সেটি তৈরি করেন ফ্রান্সের আবিষ্কারক চার্লস জেভিয়ার টমাস। ১৮২০ সালে নির্মিত যন্ত্রগণকটির নাম ছিলো 'অ্যারিথোমিটার'। পূর্ববর্তী যন্ত্রগুলোর তুলনায় উন্নত এই গণকটিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ—চার রকম অঙ্কই কষা যেতো। পরবর্তী ষাট বছরে প্রায় দেড় হাজারটি গুণফল নির্ণয়ের যন্ত্র তৈরি করেছিলেন টমাস। আশ্চর্যের কথা, বর্তমান শতাব্দীর ষাটের দশকেও প্যারিসে সে-যন্ত্র তৈরি হতো। টমাসের যন্ত্রে টাইপরাইটার মেশিনের মতো বোতাম টিপে বিভিন্ন তথ্য বা সংখ্যা ঢুকিয়ে দেওয়া যেতো যন্ত্রগণকের মধ্যে, এবং পরবর্তী গণনার

সময় সেগুলো প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা হতো। এছাড়া কোনও বিশাল গণনার বিভিন্ন ধাপের ফলাফল সঞ্চিত করে রাখা যেতো যন্ত্রের একটি বিশেষ অংশে যাকে, 'স্মৃতি-ভাণ্ডার' বা মেমারি বলা যায়।

'যান্ত্রিক কম্পিউটার' নাটকের প্রধান অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে হাজির হলেন জেভিয়ার টমাসের ঠিক পরেই। তিনি ছিলেন কম্পিউটার শাস্ত্রের 'আইজ্যাক নিউটন'। প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু কিছু প্রতিভাধর মানুষের সন্ধান আমরা পাই যাঁরা প্রকৃত সময় উপনীত হওয়ার আগেই জন্মগ্রহণ করেন ; ফলে সমকাল তাঁদের ভাবনা-চিন্তার কোনও হদিশ পায় না ; তাঁরা পুরস্কার পান ব্যঙ্গ, ঘৃণা, উপেক্ষা ও নিন্দা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ-এর ক্ষেত্রেও এসবের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দূরদর্শী অঙ্কবিদ্ আজকের দিনের অটোমেটিক ডিজিটাল কম্পিউটারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পেরেছিলেন—আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর ইতিহাস-বিখ্যাত দুটি যন্ত্রগণক 'ডিফারেন্স ইঞ্জিন' এবং 'অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন'। অথচ আধুনিক কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ তাঁর মানসপুত্র দুটির একটিকেও সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু আজ যখন আমরা আমাদের চারপাশে, শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিভিন্ন দিকে চোখ রাখি, তখন দেখতে পাই ব্যাবেজের তত্ত্বের অজস্র বাস্তব রূপায়ণ—ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটার। এটাই চার্লস ব্যাবেজের চরম আগ্রাসী সাফল্য।

চরিত্রে চার্লস ব্যাবেজ মানুষটি ছিলেন ভারী অদ্ভুত। জন্মেছিলেন ১৭৯২ সালে ইংল্যাণ্ডের ডেভনশায়ারে এক অবস্থাপন্ন পরিবারে। কিন্তু তাঁর খেয়াল ছিলো বিচিত্র রকম। সমকালীন সমাজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানান সীমাবদ্ধতা ও অজ্ঞতা তাঁকে এতোই হতাশ করে তুলেছিলো যে একবার তিনি মন্তব্য করেন, 'চতুর্বিংশ শতাব্দীতে যদি তিনটে দিনও কাটাতে পারি তাহলে আমার জীবনের বাকি বছরগুলো হাসতে হাসতে দিয়ে দেবো।' এই

প্রসঙ্গে 'অকালজন্মা' প্রতিভাধর এইচ. জি. ওয়েল্স্-এর কথা মনে পড়ে যাওয়াটা নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়।

বহুদর্শী ব্যাবেজ এক ধরনের ডুবোজাহাজ আবিষ্কার করেছিলেন, বলেছিলেন রকেটের নতুন ধরনের ব্যবহারের কথা, বাতিঘরের সংখ্যা কমানোর এক নতুন সাংখ্যিক পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। তাঁর আগ্রহ ছিলো ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে। তবে একই সঙ্গে আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াসের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়েছিলেন তিনি।

তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন দূরত্বের চিঠির জন্য বিভিন্ন ডাক খরচ নেওয়া হতো। ব্যাবেজ অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দেখালেন, কম-বেশি দূরত্বের জন্য একই হারে ডাকখরচ চালু করলে ডাকবিভাগের কর্মচারীর যে সময় ও শ্রম লাঘব হয় তাতে ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক লাভ হবে। কার্যত ব্যাবেজের অনুমান অভ্রান্ত প্রমাণিত হলো—যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি 'অসম্ভব' বলেই মনে হয়। আজও সারা পৃথিবীতে ব্যাবেজ প্রস্তাবিত ডাকব্যবস্থাই চালু রয়েছে।

ভাবতে অবাক লাগে, এ-হেন মানুষটি কবিতা লিখতেন, পার্লামেণ্টের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, জীবনবীমা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, এমন কি স্পীডোমিটার এবং সবখোল্ চাবিও আবিষ্কার করেছেন।

ব্যাবেজের চিন্তামানসে নতুন যন্ত্রগণক তৈরির প্রথম বীজ রোপিত হয় ১৮১২ সালে। নেপিয়ারের লগারিদম্-টেব্ল্-এ বেশ কিছু ত্রুটি আবিষ্কার করেন তিনি। এছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গণনা তালিকায় একই জাতীয় কয়েকটি মারাত্মক ভ্রান্তির মুখোমুখি হয়ে ব্যাবেজ মন্তব্য করেন, 'মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা কঠিন।' সেই হতাশা পীড়িত সময়ে কিভাবে তাঁর মগজে যান্ত্রিক গণনার সম্ভাবনা প্রথম জন্ম নেয়, সে-বিষয়ে নিজের লেখা 'লাইফ অফ এ ফিলসফার' বইতে ব্যাবেজ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন: 'একদিন সন্ধ্যাবেলা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির ঘরে বসে

ছিলাম। সামনের টেবিলে খোলা অবস্থায় রাখা ছিলো একটা লগারিদম্‌-তালিকা। একটু তন্দ্রা মতো এসেছে। এমন সময় সোসাটির আরেকজন সদস্য এসে ঘরে ঢুকলো। আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখে ডেকে উঠলো, "আরে ব্যাবেজ, কিসের স্বপ্ন দেখছেন?" সে-কথায় আমি উত্তর দিলাম, "ভাবছি, এসব টেব্‌ল্‌গুলো (লগারিদম্‌ টেব্‌লের দিকে আঙুল দেখিয়ে) যন্ত্র দিয়ে অঙ্ক কষে তৈরি করলে হতো।'"

এবং শুরু হলো তাঁর সৃজনশীল ভাবনা।

১৮২২ সাল নাগাদ ব্যাবেজের তাত্ত্বিক গণনা শেষ হলো। সম্পূর্ণ হলো তাঁর যন্ত্রগণকের ডিজাইন। তিনি যন্ত্রটির নাম দিলেন 'ডিফারেন্স ইঞ্জিন'। এই যন্ত্রটির সাহায্যে কোনও সংখ্যার যে কোনও ঘাত নির্ণয় করা যেতো—যেমন, $৫^{২}=২৫$, $৩^{৪}=৮১$, $২^{৫}=৩২$, ইত্যাদি। এবং এই গণনা নির্ভুল পাওয়া যেতো দশমিক চিহ্নের পর আটটি সংখ্যা পর্যন্ত। এছাড়া নির্ণয় করা যেতো যে কোনও ফাংশন বা অপেক্ষকের মান। ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন প্রাথমিক একটি যন্ত্রগণক তৈরি করছিলেন ব্যাবেজ। কিন্তু সেটিকে উন্নত রূপ দেবার পরিকল্পনায় তিনি রয়্যাল সোসাইটির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন রাখেন। ব্যাবেজ বলেন, নতুন যন্ত্রটি বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে নিজের গণনার ত্রুটি নিজেই নির্ণয় করতে পারবে, এবং তা সংশোধনও করবে। তাছাড়া কোনও অঙ্কের ফলাফল সরাসরি মুদ্রিত করবে কাগজে।

আপাতভাবে আশ্চর্য ঠেকলেও উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ সরকার এ-জাতীয় একটি যন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন ; ফলে ব্যাবেজের প্রস্তাবে তাঁরা রাজী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, দীর্ঘ বিশ বছরেও যন্ত্রটি সম্পূর্ণ না হওয়ায় ১৮৪২-৪৩ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রকল্পটি বাতিল করেন। প্রকল্পটির পেছনে সরকারী খরচ হয়েছিলো ১৭ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং, এবং অবস্থাপন্ন চার্লস ব্যাবেজ নিজেও সম্ভবত একই অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু এ-ঘটনার দশ বছর আগেই তাঁর

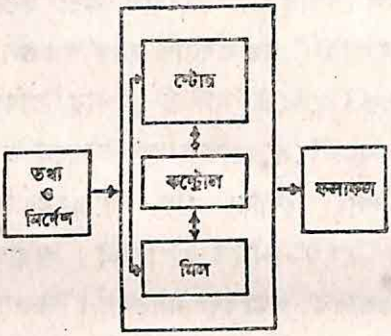
মগজে জন্ম নিয়েছে নতুন ও উন্নততর আর একটি যন্ত্রের বীজ ঃ অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন।

১৮৩৩ সালেই প্রথম যন্ত্রটির ওপর গবেষণা ইত্যাদি বন্ধ করে দেন চার্লস ব্যাবেজ। তাঁর মানসপুত্র তখন বহুবিধ গণনায় সক্ষম একটি নতুন যন্ত্রগণকঃ অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন। চিন্তা ও ধারণার দিক থেকে এটি হলো সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিগত মহান কীর্তি। আধুনিকতম ডিজিটাল কম্পিউটারের গঠন ও চরিত্রের প্রধান দিকগুলোর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিলো চার্লস ব্যাবেজের অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনে ঃ যন্ত্রগণককে নির্দেশ দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিলো 'পাঞ্চ্‌ড্‌' কার্ড বা ছিদ্র যুক্ত কার্ড। অঙ্ক কষবার সময় পথ চলতি ফলাফলগুলো পুনর্বার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা ছিলো। আর সর্বোপরি, যন্ত্রগণকের হিসেবের ফলাফল কাগজে ছাপা হয়ে যেতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে। স্পষ্টই বোঝা যায়, আজকের কম্পিউটার যে যে নীতির অনুসারী সেই নীতিগুলোকেই অভ্রান্তভাবে প্রয়োগ করেছিলেন প্রতিভাধর অঙ্কবিদ ব্যাবেজ। তফাতের মধ্যে তাঁর কম্পিউটারে বিভিন্ন নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন 'অপারেশান' কার্যকরী করে তুলতো নানান ধাতব যন্ত্রাংশ—আজকের দিনে যে ভূমিকা নিয়েছে ইলেকট্রনিক সার্কিট।

চার্লস ব্যাবেজ যে তাঁর যন্ত্রগণকে পাঞ্চ্‌ড্‌ কার্ডের ব্যবহার ভাবতে পেরেছিলেন, তা তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। ১৭৯০ সালে জোসেফ জ্যাকোয়ার্ড তাঁত শিল্পে 'পাঞ্চ্‌ড্‌' কার্ডের প্রচলন করেন। অর্থাৎ, তাঁতে বোনা কাপড়ের নকশা কি ধরনের হবে তার নির্দেশ দেওয়া থাকতো কার্ডগুলোর বিভিন্ন ছিদ্র-সজ্জার মাধ্যমে। তার আগে, ১৭৪১ সাল থেকে, তাঁতশিল্পে ব্যবহার করা হতো একটি ধাতবড্রাম—ছিদ্রগুলো বিশেষ নকশায় ছড়ানো থাকতো তারই গায়ে। সম্ভবত তাঁত শিল্পে পাঞ্চ্‌ড্‌ কার্ডের বহুল ব্যবহারই ব্যাবেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে।

ব্যাবেজের পরিকল্পনায় অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের মোট ভাগ

ছিলো তিনটে ঃ স্টোর, মিল এবং কণ্ট্রোল। 'স্টোর' বা ভাণ্ডার-এর কাজ হলো অঙ্ক কষার সময়ে বিভিন্ন ফলাফল সঞ্চয় করে রাখা— পঞ্চাশ অঙ্কের এক হাজারটি সংখ্যা পর্যন্ত সঞ্চয় করার ক্ষমতা ছিলো এই যন্ত্রগণকের ; বর্তমান যুগে 'স্টোর'কে বলা হয় 'মেমারি স্টোরেজ' বা 'স্মৃতি-ভাণ্ডার'। সংখ্যা ও তথ্য সঞ্চয় করার জন্যেও ব্যাবেজ ছিদ্রযুক্ত কার্ডের ব্যবহার চিন্তা করেছিলেন। তাঁর এই কালোত্তীর্ণ পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় ১৮৮০ সালে, এবং তার রূপকার ছিলেন হারম্যান হলারিথ্।



ব্যাবেজের যন্ত্রের প্রধান অংশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের কাঠামো

যন্ত্রের 'মিল' অংশটি ছিলো প্রকৃত গণক বা 'ক্যালকুলেটর'। এই অংশে ব্যাবেজ পাস্কালের মতোই দাঁতওয়ালা চাকার ব্যবহার করেন, তবে গণনার গতি বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশেষ কারিগরী ব্যবস্থা নেন। তার ফলে যন্ত্রটি প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে যোগ করতে পারতো, এবং দুটি সংখ্যার গুণফল বের করতে সময় নিতো এক মিনিট। সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুলো হলো অনধিক পঞ্চাশ অঙ্কের সংখ্যা। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আধুনিক কম্পিউটার প্রতি সেকেণ্ডে দশ লক্ষেরও বেশি যোগফল নির্ণয় করতে সক্ষম।

যন্ত্রের শেষ প্রধান অংশ 'কণ্ট্রোল'-এর কাজ প্রকৃতপক্ষে দুটি। এক ঃ লক্ষ্য রাখা যে যন্ত্রগণক নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে অঙ্কের বিভিন্ন ধাপের নির্দেশ পালন করছে কি না। দুই ঃ অসংখ্য গীয়ার ও চাকার

মাধ্যমে 'মিল' এবং 'স্টোর'-এর মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান করা।

বর্তমান কালে উপরোক্ত প্রধান তিন অংশের সম্মিলিত নাম 'সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট' বা সংক্ষেপে 'সি.পি.ইউ'।

কম্পিউটারকে অঙ্ক কষার জন্য বিভিন্ন ধাপে যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয় তাকেই অধুনা বলা হয় 'প্রোগ্রাম'। যিনি এই নির্দেশ দেন তিনি হলেন 'প্রোগ্রামার'। পৃথিবীর প্রথম 'প্রোগ্রামার' হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে আছেন প্রখ্যাত কবি লর্ড বায়রনের কন্যা আডা অগাস্টা লেডী লাভলেস। তিনি ছিলেন চার্লস ব্যাবেজের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞান-বিষয়ে ছিলেন কৌতূহলী। ফলে ব্যাবেজের যন্ত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এই যন্ত্রগণকটির জন্য বহু 'প্রোগ্রাম' অথবা 'নির্দেশাবলী' লেডী লাভলেসই লিখে দিয়েছিলেন।

এ-হেন পরিশ্রম সত্ত্বেও ব্যাবেজের যন্ত্র ত্রুটিহীন হয়নি। সে-যুগের কারিগরী দক্ষতা তেমন নিপুণ না হওয়ায় অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের বহু যন্ত্রাংশই নিখুঁতভাবে তৈরি করা যায় নি। তবে ব্যাবেজের রেখে যাওয়া নকশা ও কাগজপত্র পরীক্ষা করে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া গেছে যে তাঁর তত্ত্বগত ধ্যান-ধারণায় কোনও ত্রুটি ছিলো না।

দ্বিতীয় যন্ত্রের জন্য সরকারী সাহায্য পাননি চার্লস ব্যাবেজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হাল ছাড়েননি। বহু বছর ও বহু অর্থব্যয় করেছেন তার মানসপুত্রের সার্থক রূপায়ণে। ১৮৪২ সালে প্রকাশিত লেডী লাভলেসের বর্ণনা থেকেই আমরা উত্তরকালে যন্ত্রটি সম্পর্কে এতো তথ্য জানতে পেরেছি। ব্যাবেজের অসম্পূর্ণ যন্ত্রটি লণ্ডনের 'সায়েন্স মিউজিয়াম'-এ আজও সংরক্ষিত রয়েছে।

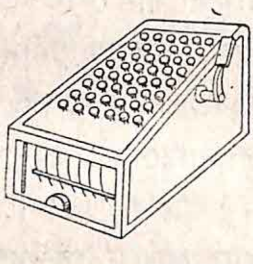
১৮৭১ সালে চার্লস ব্যাবেজের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায় এবং আংশিক সাফল্যও সে লাভ করেছিলো।

সে-যুগে পূর্ণ সফলতা না পেলেও বর্তমান যুগের শত-সহস্র ডিজিটাল কম্পিউটার আজও নীরবে ব্যাবেজকে শ্রদ্ধা জানায় এবং প্রমাণ দেয় তার নজীরবিহীন সাফল্যের। সমকাল তাঁকে না চিনতে

পারলেও উত্তরকাল তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে পরম সম্মান জানিয়েছে।

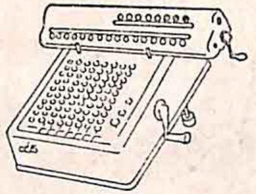
চার্লস ব্যাবেজের মৃত্যুর প্রায় এক শতক পরে মার্কিন অঙ্কবিদ নরবার্ট উইনার কম্পিউটার-গণিতের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং মার্কিন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার ভ্যানেভার বুশ ও অন্যান্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ব্যাবেজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেন। ১৯২৫ সালে তাঁরা তৈরি করেন প্রথম অ্যানালগ কম্পিউটার।

ব্যাবেজের সময়ে যন্ত্রগণক নিয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা করেছেন আরও বেশ কিছু শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তিবিদ। তবে তাঁরা মূলত প্রচলিত যন্ত্রগুলোর উন্নতি সাধনের চেষ্টাতেই সময় ও মেধা খরচ করেছেন। যেমন ১৮৫০ সালে ডর্ ফেল্ট একটি চাবি-চালিত গণকের পেটেন্ট নেন। তবে যন্ত্রটি শুধুই যোগ ও বিয়োগ করতে পারতো। ১৮৮৬-৮৭ সালে যন্ত্রটিকে আরও উন্নত রূপ দেওয়া হয়। প্রায় একই সময়ে উইলিয়াম সেওয়ার্ড বারোজ প্রথম সফল বাণিজ্যিক যন্ত্রগণক তৈরী



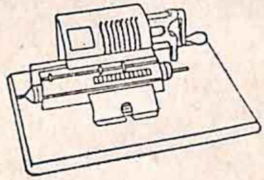
১৮৮১-৮৬ সালে বারোজ প্রচলিত যোগ করার যন্ত্রগণক

করেন। সেটিকে পরবর্তীকালে বহুভাবে উন্নত করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজনটি ঘটে ১৮৮৯ সালে। যন্ত্রটি ফলাফল মুদ্রিত করতে শেখে। এরপর মন্‌রো ও মার্চ্যান্ট এর যন্ত্রগণক প্রচলিত হয় ১৯১১ সালে, এবং যন্ত্রগণকে ইলেকট্রিক মোটরের ব্যবহার প্রবর্তন করা হয় ১৯২০ সাল নাগাদ। এছাড়া সমসাময়িকভাবে গড়ে ওঠে হিসেব-নিকেশের অ্যানালগ পদ্ধতি—যার পরিণতি অ্যানালগ



মন্‌রো যন্ত্রগণকের আদি মডেলের স্কেচ

কম্পিউটার। কিন্তু ডিজিটাল কম্পিউটারের সঙ্গে ক্ষমতা এবং অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় অ্যানলগ কম্পিউটার আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে।



মারচ্যাণ্ট যন্ত্রগণকের আদি মডেলের স্কেচ

ধাতব যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি কম্পিউটারের যুগ শেষ হয় ১৯৩৭ সালে, যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়ার্ড আইকেন্ আই. বি. এম. কর্পোরেশনের সঙ্গে যুগ্মভাবে গবেষণা করে দীর্ঘ সাত বছরের চেষ্টায় তৈরি করেন পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার 'হার্ভার্ড মার্ক ওয়ান'—আমরা পেলাম ব্যাবেজের পরিকল্পনার সার্থক রূপ। এর পরে অবিশ্বাস্য গতিতে ডিজিটাল কম্পিউটার এক ধারা থেকে অন্য ধারায় এগিয়ে চলেছে—শুরু হয়েছে তারও বিবর্তন। একই সঙ্গে এই 'কম্পিউটার' নামধারী যন্ত্রটি মানবজীবনে যেন হয়ে উঠেছে অঙ্গাঙ্গী, এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের নির্ভরশীল করে তুলছে তার ওপরে। হয়তো সেই কারণেই আজকের যুগ 'কম্পিউটারের যুগ'।

পরিশেষে প্রচলিত একটি আপ্তবাক্যের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 'টু অ্যার্ ইজ হিউম্যান।' মানুষের এই সহজাত ভ্রান্তির সম্ভাবনাকে নির্বাসন দেবার জন্যই এসেছে কম্পিউটার। কারণ ঃ 'নট টু অ্যার্ ইজ কম্পিউটার।'

অনীশ দেব—এর জন্ম ২২শে অক্টোবর, ১৯৫১। প্রথম পড়াশোনা হিন্দু স্কুলে। পরে সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন, এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ফলিত পদার্থবিদ্যায় এম. টেক. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৭৬ সালে। কর্মজীবনে তিন বছরেরও বেশি জড়িত ছিলেন একটি ডিজাইন ও কারিগরী সংস্থার ইন্সট্রুমেণ্টেশান ও কণ্ট্রোল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে। পরে ১৯৮৩ থেকে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনায় যোগ দেন। বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর লেখালেখি বেশ কয়েক বছর ধরে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ে নিয়মিত লিখছেন এখনও। এ-বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত প্রথম বই 'বিজ্ঞানের হরেকরকম'। বর্তমান বইটি দ্বিতীয়।